**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : অত্তাউর রহমান |
| Title : চতুরঙ্গ | Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ২০/১<br>২০/৩<br>২০/৪ | Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৫<br>কার্তিক - পৌষ ১৩৬৫<br>মাঘ - চৈত্র ১৩৬৫ |
| | Condition : Brittle / Good ✓ |
| Editor : হুমায়ুন কবির | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫

**কাকে আপনি পছন্দ করবেন ?**
**'স্যানফোরাইজ্‌ড্'-এর খবর যিনি রাখেন তাঁকেই !**

লক্ষ্য রাখবেন, আপনার বেশভূষা এমন হওয়া চাই যাতে প্রতিটি সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে যায়। সুতী কাপড় বা তৈরী পোশাক কেনার সময় 'স্যানফোরাইজ্‌ড্' ছাপ দেখে নেবার কথা কখনো ভুলবেন না। বার বার ধোয়ার পরেও যে আপনার পোশাক কুঁচকে ছোট হয়ে যাবে না, এই ছাপটি তারই গ্যারান্টী !

লেবেলের ওপর **'স্যানফোরাইজ্‌ড্'** রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের ছাপ দেখে নেবেন, তাহলে আপনার জামাকাপড় আর কখনো কুঁচকে ছোট হয়ে যাবে না !

'স্যানফোরাইজ্‌ড্' রেজিস্টার্ড ট্রেড-মার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট পীবডি এণ্ড কোং ইন্‌ক (সীমিত দায়সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত) কর্তৃক প্রচারিত। যে সমস্ত কাপড় এই কোম্পানীর সংকুচন রোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কেবল তাতেই 'স্যানফোরাইজ্‌ড্' ট্রেড মার্ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

অনুসন্ধান করুন : 'স্যানফোরাইজ্‌ড্' সার্ভিস, ২৫ মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই-২।

ACP 6134

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

মওলানা আজাদের কাহিনী ১
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ চীনা তর্জমা ১১
যুবনাশ্ব ॥ কুড়ানি ১২
বিষ্ণু দে ॥ যে কথা ১৪
হুমায়ুন কবির ॥ ভীরু ১৫
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ বানপ্রস্থের পণ ১৭
বুদ্ধদেব বসু ॥ এক গ্রীষ্মে দুই কবি ২১
আলবেয়ার কামু ॥ অচেনা ৩১
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : প্রাচীন যুগ ৫২
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ৫৭
সমালোচনা—সরোজ আচার্য, অশোক মিত্র, বিনয় ঘোষ,
কমলকুমার মজুমদার, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৬৪

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

## সামান্য একটু সৌজন্য

শীতের রাতে ট্রেনের
কামরায় জোয়ান মানুষ
সারা বেঞ্চি জুড়ে কম্বল মুড়ি
দিয়ে শুয়ে আছে···
পাশেই হয়ত বাচ্চা এক ছেলে
মালপত্রের ওপর ঠায়
বসে' শীতে
কাঁপছে···এক কোণে ভীড়ের
চাপে কোন মহিলা
হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন···বুড়ো
অথর্বদের ফিরে
দেখছেই না কেউ···ট্রেনের
কামরায় এই ধরনের
অপ্রীতিকর দৃশ্য
হামেশাই চোখে পড়ে।
অথচ সহযাত্রীদের
সামান্য একটু
সৌজন্যে সকলের
পক্ষেই ট্রেন-ভ্রমণ প্রীতিকর
হ'য়ে উঠতে পারে।
মিষ্টি কথা আর আন্তরিক
ব্যবহারে পথের অনেক
কষ্ট অনেক অসুবিধাই
হাসি মুখে সহ্য করা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/6

বিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

চতুরঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫

# মওলানা আজাদের কাহিনী

[মওলানা আজাদের ইচ্ছা ছিল যে তিন খণ্ডে তিনি নিজের জীবনী সম্পূর্ণ করবেন। প্রায় দুই বছর আগে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়, এবং তিনি আত্মকথা বলতে শুরু করেন। তিনি উর্দুতে বলে যেতেন, এবং তাঁর কথনের ভিত্তিতে ইংরিজিতে বইখানির রচনা শুরু হয়। দ্বিতীয় খণ্ড তিনি সম্পূর্ণ দেখে এবং অনুমোদন করে যেতে পেরেছিলেন, এবং স্বতন্ত্রভাবে তার প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুই বলতে চাননি, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড আত্মকথার খসড়া তৈরী হবার পরে প্রথম খণ্ডে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতেও রাজী হন। প্রথম খণ্ডের জন্য একটি সংক্ষিপ্তসারও তৈরী করা হয়, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে তাকে প্রকাশ করার কথা ঠিক হয়। সেই সংক্ষিপ্তসারের বাঙলা অনুবাদ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় বইখানির প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হল, পরে আরো দুই তিনটি অধ্যায় প্রকাশেরও ইচ্ছা আছে। প্রথম খণ্ডের কাজ আর সমাপ্ত হ'ল না, তৃতীয় খণ্ডের রচনাও শুরু সম্ভব হয়নি।—হুমায়ুন কবির]

১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন পাশ হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নতুন নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষেই বিপুলভাবে জয়লাভ করে। পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস এককভাবে আইনসভার অর্ধেকেরও বেশি আসন দখল করে। বাকি চারটি প্রদেশের আইনসভায়ও অন্যান্য দলের তুলনায় কংগ্রেসই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী দল পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র পঞ্জাবে এবং সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেস নানা কারণে অনুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

কংগ্রেসের এ সাফল্যের তাৎপর্য ঠিকভাবে বুঝতে হলে পূর্ব-অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম দিকে কংগ্রেস নির্বাচনে নামতেই চায়নি। ১৯৩৫ সালের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল বটে কিন্তু এত রকম শর্ত ও সংরক্ষণে তাকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছিল আর প্রাদেশিক লাটসাহেবের হাতে এত বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল যে তার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাস্তব হবে কিনা সে-বিষয়ে কংগ্রেসী মহলে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়। লাটসাহেবের নিজের ইচ্ছামত Emergency বা সংকট ঘোষণার অধিকার ছিল, এবং একবার সংকট ঘোষণা করলে সংবিধান রদ হয়ে সমস্ত ক্ষমতা লাট-সাহেবের হাতে চলে আসবে। ফলে লাটসাহেবের মর্জিমাফিক যেখানে প্রাদেশিক গণতন্ত্রের মেয়াদ, তাকে সত্যিকার গণতন্ত্র বলা চলে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। প্রাদেশিক শাসনে

জনসাধারণের খানিকটা হাত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারে বড় লাটসাহেবের ক্ষমতা আরও বেশি এবং আরও নিরংকুশ। শ্বেত শাসন প্রদেশে সার্থক হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারেও এবার শ্বেত শাসন-ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা হল। কেন্দ্রের গভর্নমেণ্ট Federal। শুধু তাই নয়, দেশীয় রাজ্য এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থকে সেখানে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারে গণতন্ত্রের অবকাশ ছিল না বললেই চলে। ব্রিটিশের মনে আশা ছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি এবং ধনিক-বণিক সম্প্রদায় তাদের মতেই চলবে, কাজেই গণতন্ত্রের মুখোশ কেবল মুখোশই থেকে যাবে।

কংগ্রেস দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল। কাজেই কংগ্রেস যে এ শাসন-ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। যে ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজ দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস তাকে সরাসরিভাবে অস্বীকার করল। শুধু তাই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে অনেকেই বহুদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকার করতে চাননি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তো নির্বাচনে যোগ দিতেও প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। আমি তাঁদের মত মানতে পারিনি। আমার মত ছিল যে নির্বাচন বর্জন করলে মস্ত বড় ভুল হবে। কংগ্রেস নির্বাচনে না আসলে অবাঞ্ছনীয় দল এবং ব্যক্তি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দখল করে ভারতবর্ষের জনসাধারণের নামে কথা বলবার অধিকার পাবে। তা ছাড়া নির্বাচন প্রতিযোগিতার মারফত ভারতীয় জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার এক সুবর্ণসুযোগ মিলবে। অবশেষে আমার কথাই টিকল এবং কংগ্রেস নির্বাচন-দ্বন্দ্বে যোগ দিল। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যের কথা আগেই বলেছি।

নির্বাচনের শেষে কংগ্রেসনেতৃত্বের মধ্যে আবার নতুন করে মতভেদ দেখা দিল। যাঁরা নির্বাচনে যোগ দেবার পক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁরা যুক্তি দিলেন যে লাটসাহেবের হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ফাঁকি ছাড়া কিছু বলা চলে না। লাটসাহেবের মর্জি না হলে মন্ত্রিত্ব একদিনও টিকবে না। কংগ্রেসের নির্বাচন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে চাইলে লাটসাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষও অনিবার্য। তাঁরা বললেন যে আইনসভার মারফতই সংবিধানকে অচল করতে হবে। আমি এবারও তাদের কথা মানতে পারিনি। আমি বললাম যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে যে ক্ষমতা পাওয়া গেছে, তাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে। যদি কাজ করতে গিয়ে লাটসাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তবে সে সংঘর্ষ এড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ না করলে কংগ্রেসের প্রোগ্রামকে কার্যকরী করা যাবে না। যদি জনপ্রিয় কোন কর্মপ্রচেষ্টায় লাটসাহেব বাধা দেয়, এবং তার ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তবে জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়বে বই কমবে না।

আমাদের এ বিতর্ক কবে শেষ হবে সেজন্য সরকার বসে থাকেনি। বিভিন্ন প্রদেশের লাটসাহেবরা যখন দেখলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে ইতস্তত করছে তখন তাঁরা আইনসভার অন্য দল নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন শুরু করলেন। যে-সব দল নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও লাটসাহেবের আমন্ত্রণে তারা অ-কংগ্রেসী ও কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠন করল। কংগ্রেসের এই দ্বিধার ফলে দুইভাবে দেশের ক্ষতি হল। এক তো কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মতভেদ দেশের সামনে প্রকট হয়ে উঠল। দ্বিতীয়তঃ দেশের যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নির্বাচনে হেরে মুষড়ে পড়েছিল তারা নতুন করে শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পেল।



বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেসের এই আলোচনার একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল যে প্রাদেশিক লাটসাহেবরা যেন কংগ্রেস মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কাজে বাধা না দেন। বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার পরে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সভ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে মত দিলেন, কিন্তু মুশকিল হল এই যে কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত এত বার এবং এত জোরে ভারত-আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল যে এখন খোলাখুলিভাবে সিদ্ধান্ত বদল করবার কথা বলতে সবাই ইতস্তত করতে লাগলেন। জওহরলাল তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিপক্ষে এত প্রবলভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন যে এখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওয়ার্ধায় যখন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল, দেখলাম যে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নতুন প্রস্তাব আনতে সবাই দ্বিধা করছেন। আমি তখন সরাসরি প্রস্তাব করলাম যে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত। খানিকক্ষণ আলোচনার পর গান্ধীজীও আমার মতে মত দিলেন এবং স্থির হল যে কংগ্রেস যে সমস্ত প্রদেশে একক-ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হোক। কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এর পূর্বে কোনদিনই কংগ্রেস দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়নি। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম খোলাখুলি ভাবে রাজকার্যভার গ্রহণের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করা হয়।

এ সময়ের একটি ঘটনায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোককেই নেতৃত্বের অবকাশ দিয়েছিল। ফলে বোম্বাই প্রদেশে নরিমান ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সর্ববাদিসম্মত নেতা। যখন স্থির হল যে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করবে তখন সবাই ভেবেছিল যে নরিমানই বোম্বাইয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। কাজের বেলা কিন্তু তা হল না। সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর সহকর্মীরা নরিমানকে পছন্দ করতেন না। ফলে নরিমানের বদলে বি. জি. খের বোম্বাইয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। নরিমান পার্শি আর খের হিন্দু। কাজেই অনেকেই বলাবলি করতে লাগল যে সাম্প্রদায়িক কারণেই নরিমানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সমান কঠিন, তাই সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, এ ধরনের অপবাদ সহজে কাটানো যায় না।

এ সিদ্ধান্তে নরিমান স্বভাবতই বিচলিত হলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সামনে সর্দার প্যাটেলের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। জওহরলাল তখনও কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। জওহর-লালের মনে লেশমাত্র সাম্প্রদায়িকতা ছিল না বলে অনেকেই আশা করেছিল যে তিনি নরিমানের প্রতি সুবিচার করবেন। দুর্ভাগ্যবশত তা হল না। জওহরলাল সর্দার প্যাটেলের অনেক কাজই অপছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সর্দার প্যাটেল কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে এরকম অবিচার করবেন না। তিনি নরিমানের অভিযোগে খানিকটা বিরক্তও হলেন এবং তা সরাসরিভাবে ব্যক্তও করে দিলেন।

নরিমান জওহরলালের ব্যবহারে আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে গান্ধীজীর হাতেই তিনি সমস্ত মামলা অর্পণ করতে চান। গান্ধীজী ধীরভাবে তাঁর কথা শুনলেন এবং রায় দিলেন যে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হোক।

সর্দার প্যাটেল এবং তাঁর বন্ধুরা বললেন যে নরিমান পার্শি, তাই এই অভিযোগের

তদন্তের ভার একজন পার্শি'র হাতেই দেওয়া হোক। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা এ প্রস্তাব করেন। এবং মামলা এমনভাবে সাজানো হল যে নরিমানের আসল অভিযোগ চাপা পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রভাব নানাভাবে এমন কার্যকরী হল যে তদন্ত শুরু হবার আগেই নরিমান হেরে গেলেন। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র পার্শি বলেই নরিমানকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি একথা প্রমাণ করা খুব কঠিন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকে না। এ ঘটনার পর নরিমানের মন একেবারে ভেঙে যায় এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে।

নরিমানের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে যে ব্যবহার করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথা আমার মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেসব প্রবল ব্যক্তিত্ব এদেশে দেখা দেয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। বস্তুতপক্ষে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে দেশবন্ধুর স্থান অতি বিশিষ্ট। তাঁর উদার দৃষ্টি ও বিরাট কল্পনার সঙ্গে মিলেছিল কঠোর বাস্তববোধ। আদর্শবাদীর হৃদয় এবং বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সমস্ত প্রশ্নের বিচার করতেন বলে আদর্শকে কিভাবে কার্যে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, বাক্যে এবং কার্যে তাই প্রকাশ করতেন। যা সত্য মনে হত, লোকমত গ্রাহ্য না করে তাই ঘোষণা করতেন। গান্ধীজী যখন প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তখন দেশবন্ধু দাশ তার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় যখন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় তখন অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা নিয়ে তাঁর মনে যে সন্দেহ ছিল তা তিনি গোপন করেননি। এক বছর পরে যখন নাগপুরে কংগ্রেসের আবার অধিবেশন হয়, তত্দিনে তাঁর মত বদলে গিয়েছিল এবং তিনি আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগদান করেন। সে সময়ে কলকাতার হাইকোর্টে তাঁর বিরাট পসার। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সার্থক ও রোজগারে আইনজীবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। টাকা কেবল রোজগারই করেননি, খরচও করতেন দেদার। বস্তুত, দেশবন্ধু দাশ সেকালে আরাম-আয়াস পছন্দ করতেন, তাঁকে বিলাসপ্রিয় বললেও বোধ হয় অন্যায় হত না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি এক মুহূর্তেই বিরাট পসার পরিত্যাগ করে বিলাসব্যসন বর্জন করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। অন্যান্য সকলের মত আমিও তাঁর এ বিরাট আত্মত্যাগে অভিভূত হই।

আগেই বলেছি যে দেশবন্ধু দাশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তববাদী। রাজনৈতিক প্রশ্নের বিচারে কি হওয়া উচিত এবং কি করা সম্ভব এই দুই বিষয়েই তাঁর দৃষ্টি সমান সজাগ ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে যদি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অহিংস উপায়ে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে চাই তা হলে পদে পদে ধীরে ধীরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক সম্মতির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আকস্মিকভাবে আসতে পারে না। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে স্বাধীনতার পথে আমরা প্রথম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পরিমিতক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন এগিয়ে আসবে—তার ফলে যখন এবং যেভাবে বৃহত্তর দায়িত্ব আয়ত্তে আসবে আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারব। তাঁর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে যে ভারত-শাসন আইন পাশ হয় তাতে তাঁর বিচার ও দূরদৃষ্টির স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

১৯২১ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসেন। মণ্টফোর্ড রিফর্ম



অনুযায়ী যে প্রাদেশিক দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন হয়েছিল তাকে চালু করতেই তাঁর আগমন। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেছিল যে যুবরাজের শুভাগমনের জন্য যেখানে যে অনুষ্ঠান হবে তাকে বর্জন করা হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সরকার এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল। বড়লাট ইংরাজ সরকারকে ভরসা দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ যুবরাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করবে। কংগ্রেসের বর্জন সিদ্ধান্তকে বাতিল করবার জন্য বড়লাট তাই চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, যুবরাজ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক শহরেই অনাদৃত হলেন। অবশেষে যুবরাজের কলকাতায় আসবার দিন আসন্ন হয়ে এল। তখনও কলকাতা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। রাজধানী দিল্লীতে চলে গেছে কিন্তু কলকাতার গুরুত্ব কমেনি। বড়লাট প্রত্যেক বৎসর শীতকালে কলকাতায় বড়দিন যাপন করতেন। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উদ্বোধন করবার জন্য শহরে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সরকার এই অনুষ্ঠানকে সার্থক এবং যুবরাজের কলকাতায় আগমনকে সফল করবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি।

আমরা সবাই তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিলেন। বড়লাটের সঙ্গে আলাপের ফলে তাঁর ধারণা হয় যে যুবরাজের কলকাতায় আগমনের সময় আমরা যদি হরতাল না করি, তা হলে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করতে রাজী হবে। পণ্ডিত মালব্য আলিপুর জেলে এসে দেশবন্ধু দাশ এবং আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি যে প্রস্তাব নিয়ে আসেন তার মোটা কথা এই যে কলকাতায় হরতালের ব্যাপারে আমরা যদি সরকারের কথা রাখি, তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে। আমরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পণ্ডিত মালব্যকে পরে উত্তর দেব বলে জানালাম। দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরে আমিও এই সিদ্ধান্তে পেঁাছলাম যে যুবরাজের ভারত-আগমনের সময় অভ্যর্থনার বদলে হরতাল করার ফলেই ভারত সরকার আপোষ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। গোলটেবিল বৈঠক হলেই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে একথা আমরা ভাবিনি। কিন্তু এরকমভাবে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ হলে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম যে অনেকখানি এগিয়ে যাবে সে বিষয়েও আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। গান্ধীজী ছাড়া কংগ্রেসের বাকি সকল নেতাই তখন জেলে। আমরা স্থির করলাম যে একটি শর্তে আমরা সরকারের আপোষ-প্রস্তাবে রাজী হব : গোলটেবিল বৈঠক বসবার আগে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে হবে।

পরদিন পণ্ডিত মালব্য যখন আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তাঁকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম তিনি যেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সম্মতি লাভ করেন। পণ্ডিত মালব্য বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। দুদিন পরে আবার তিনি আলিপুর জেলে এলেন এবং বললেন যে গোলটেবিল বৈঠকে যাঁরা যোগদান করবেন সে সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দিতে সরকার রাজী হয়েছে। সে তালিকায় মহম্মদ আলি ও শওকত আলি ছাড়া আরও অনেকের নাম ছিল। আমরা আমাদের মতামত পরিষ্কার করে লিখে দিলাম। পণ্ডিত মালব্য সেই দলিল নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে বিস্ময় ও দুঃখের সঙ্গে আমরা শুনলাম যে গান্ধীজী আমাদের প্রস্তাবে রাজী হননি। তিনি দাবি করলেন যে, রাজনৈতিক সমস্ত নেতাদের, বিশেষ করে মহম্মদ আলি ও শওকত আলিকে প্রথমে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। সকলে মুক্তি পাবার পর আমরা বিবেচনা করব যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেব কিনা। দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে আমারও মনে হল যে গান্ধীজী মস্ত বড় ভুল করলেন। সরকার যখন নিজেই স্বীকার করেছে যে গোলটেবিল বৈঠকের আগে প্রধান প্রধান কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেবে, তখন এরকম বিনা শর্তে মুক্তির দাবি তোলা অর্থহীন মনে হল। পণ্ডিত মালব্য আমাদের মন্তব্য নিয়ে আবার গান্ধীজীর কাছে গেলেন, কিন্তু গান্ধীজীর মত বদলাল না। ফলে বড়লাটও গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। কলকাতায় ইংরেজ যুবরাজের আগমনকে সফল করবার জন্যেই তিনি এ আপোষ-প্রস্তাব এনেছিলেন। আপোষ হল না বলে কলকাতায় বিরাট হরতাল হল, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক বোঝাপড়ার এক সুবর্ণসুযোগ নিজেদের দোষে হারালাম। এই পরিণতিতে দেশবন্ধু দাশের মনে যে দুঃখ ও বিরক্তি এসেছিল তা তিনি গোপন করেননি।

গান্ধীজী এবার শ্রীশঙ্করণ নায়ারের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে এক সম্মেলন ডাকলেন। সেখানে তিনি নিজেই এক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব আনেন। পণ্ডিত মালব্য পূর্বে যে প্রস্তাব এনেছিলেন তার সঙ্গে গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইতিমধ্যে যুবরাজ ভারতবর্ষ থেকে চলে গিয়েছিলেন বলে ভারত সরকার গান্ধীজীর প্রস্তাবকে মোটে আমলই দিল না। দেশবন্ধু দাশ এ ব্যাপারে আরও অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, গান্ধীজী চালে মস্ত বড় ভুল করেছেন। দেশবন্ধু দাশের এ সিদ্ধান্ত আমিও অস্বীকার করতে পারিনি।

কিছুদিন পরে চৌরিচোরার ঘটনা নিয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। তার ফলে রাজনৈতিক মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সমস্ত দেশ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সরকার এ অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ নেয় এবং গান্ধীজীকে গ্রেফতার করে। তাঁকে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এমনি করে ধীরে ধীরে অসহযোগ আন্দোলন মিইয়ে পড়ে অবশেষে একদিন শেষ হয়ে গেল।

দেশবন্ধু দাশ প্রায় প্রত্যেক দিনই আমার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধীজী যে নিদারুণ ভুল করেছেন এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দেশবন্ধু দাশ বলতেন যে গান্ধীজীর ভুল চালের ফলে রাজনৈতিক কর্মীরা এখন এত মুসড়ে পড়েছে যে তাদের মধ্যে উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনতে বহু বৎসর সময় লাগবে। দেশবন্ধু দাশ দেখলেন যে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি স্থির করলেন জনসাধারণের উৎসাহ ও সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্য দেশের সামনে নতুন কার্যক্রম পেশ করতে হবে। কবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে তার অপেক্ষায় বসে থাকবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি বললেন যে মজুদ অবস্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে, আইন-সভার মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাতে হবে। গান্ধীজীর কথামত ১৯২১ সালে কংগ্রেস নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নামেনি। দেশবন্ধু দাশ বললেন, ১৯২৪ সালের নির্বাচনে আইনসভা দখল করে তাদের মারফত রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের চেষ্টা করতে হবে। দেশবন্ধু দাশের বিশ্বাস ছিল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সকলেই তাঁর এ বিশ্লেষণ ও সমাধান মেনে নেবেন। দেশবন্ধু দাশকে আমার অতিরিক্ত আশাবাদী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর একথা আমি মেনে নিয়েছিলাম যে মুক্তির পরে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের সামনে এক নতুন কর্মপন্থা পেশ



করা তাঁর কর্তব্য।

গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেশবন্ধু দাশ বেরিয়ে এলেন। অভ্যর্থনা সমিতি তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করে। তাতে তাঁর মনে হল সমস্ত দেশ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং সর্দার বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর মতে সায় দেওয়ায় তাঁর এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু দাশ বললেন যে আইনসভায় প্রবেশ করে কংগ্রেস ভিতর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার নীতি গ্রহণ করুক। গান্ধীজী তখনও জেলে। শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কয়েকজন প্রধান দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তাঁদের মনে হল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মপন্থা বর্জন করে কংগ্রেস যদি দেশবন্ধু দাশের কথা মেনে নেয় তা হলে সরকার ভাববে যে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে চায়।

শ্রীরাজাগোপালাচারী দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাবের যে-অর্থ করেছিলেন তাকে ঠিক মনে করা চলে না। দেশবন্ধু দাশ সরকারের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব আনেননি বরং রাজনৈতিক সংগ্রামকে নতুন ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। একথা তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যেরা তাঁর কথা মানেনি। দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাব টিকল না এবং গয়া কংগ্রেস দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। দেশবন্ধু দাশ সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। কংগ্রেসের সদস্যদের সমস্ত উদ্যম আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদে ক্ষয় হতে লাগল। একদলের নাম হল Pro-changer বা পরিবর্তনপন্থী, অন্য দলের নাম হল No changer বা পরিবর্তনবিরোধী।।

ছ-মাস পরে আমিও মুক্তিলাভ করলাম। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম যে কংগ্রেসের সম্মুখে দারুণ সংকট। সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের বদলে ঘরোয়া বিবাদই কংগ্রেস কর্মীদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খাঁ কর্মপন্থা বদলাবার আন্দোলনের নেতা। শ্রীরাজাগোপালাচারী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিবর্তনবিরোধীদের প্রধান কর্মী। দুই দলই আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কোন দলে যোগ দিতেই আমার মন সায় দিল না। আমি দেখলাম এ সমস্ত ঘরোয়া বিবাদ সময়মত না মেটালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভেঙে পড়বে। তাই স্থির করলাম যে কোন দলেই যোগ দেব না, বরং রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমার প্রয়াস সফল হয়েছিল এটা আমার পক্ষে আনন্দের কথা। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় এবং দুই দলেরই অনুমোদন নিয়ে আমি সভাপতি নির্বাচিত হই।

আমাদের আসল উদ্দেশ্য দেশের মুক্তিসাধন, এই কথারই উপর সভাপতির অভিভাষণে আমি বিশেষ জোর দিই। ১৯১৯ সালে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী অবলম্বন করি এবং প্রায় চার বছর সেই কার্যক্রম চালিয়ে ফলও যথেষ্ট পেয়েছি। এখনকার পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি মনে করেন যে এখন আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম নিয়ে যেতে হবে তবে পুরাতন সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়ে তাদের বাধা দেওয়ার সার্থকতা নেই। লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি মতভেদ না থাকে তবে কেবল উপায় নিয়ে কলহ নিষ্ফল, প্রত্যেক দলের নিজ নিজ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়।

আমি যা আশা করেছিলাম দিল্লী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তও তাই হল। পরিবর্তনপন্থী এবং পরিবর্তনবিরোধী দুই দলই কর্মপন্থায় পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। শ্রীরাজাগোপালাচারী,

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁদের সহকর্মীরা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দেশবন্ধু দাশ, হাকিম আজমল খাঁ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচনে নামলেন। তাঁদের এ সিদ্ধান্তে দেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের টিকেটে বহুসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন।

পরিবর্তনবিরোধী দলের অন্যতম প্রধান আপত্তি ছিল যে আইনসভায় যোগদান করলে সরকার ভাববে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের আস্থা কমে গেছে। ফল হল কিন্তু ঠিক বিপরীত। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দল এক প্রস্তাব পেশ করল যে গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। প্রস্তাব পাশ হবার আগেই সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিল।

আগেই বলেছি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভায় স্বরাজ্য দলের টিকেটে বহু সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির অধিকার বোধ হয় স্বরাজ্য দলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। দেশবন্ধু দাশের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বাস্তববোধের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচনমণ্ডলীতে কেবলমাত্র মুসলমান ভোটারের ভোটে আইনসভায় মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হতেন। তার ফলে মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দল মুসলমান সমাজের ভয়-ভাবনাগুলির উপর জোর দেওয়ায় আইনসভায় সাধারণত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সদস্যেরাই নির্বাচিত হত। দেশবন্ধু দাশ বাংলাদেশের মুসলমানদের ভয়-ভাবনা দূর করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন এবং বাংলার মুসলমান তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। তিনি যেভাবে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করেছিলেন তা স্মরণীয়। তাঁর নীতি আন্তরিকভাবে মেনে চললে বর্তমানের বহু সমস্যারও সমাধান সহজ হবে।

বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও নানা কারণে শিক্ষায় এবং সম্পদে পিছিয়ে পড়েছিল। প্রদেশের বাসিন্দার অর্ধেকের বেশি মুসলমান হলেও সরকারী চাকুরিতে শতকরা তিরিশজন মুসলমানেরও স্থান ছিল না। দেশবন্ধু দাশের প্রখর বিষয়বুদ্ধি ও বাস্তববোধ ছিল বলে তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন যে যাকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলা হয়, তা মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বৈষয়িক ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা কংগ্রেসে যোগদান করবে না, যোগ দেবার আশা করাও অন্যায়। তিনি যে ঘোষণা করলেন তার প্রভাব কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন যে বাংলাদেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে আসলে সমস্ত সরকারী চাকুরির শতকরা ষাটটি মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং যতদিন পর্যন্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে তারা নিজেদের ন্যায্য ভাগ না পাবে, ততদিন এই ব্যবস্থা চালু থাকবে। কলকাতা কর্পোরেশনের ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাব আরও বেশি দূর প্রসারী। তিনি বললেন, মুসলমানেরা জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরি না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত নতুন চাকুরির শতকরা আশিটি তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। তিনি একথাও বললেন যে যতদিন পর্যন্ত জনসেবার ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং চাকুরিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় নিজের স্থান পাবে না ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র হতে পারে না। মজুদ অবস্থার অন্যায় ও অসাম্য দূর হয়ে গেলে তখন মুসলমান সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারবে এবং বিশেষ ব্যবস্থা বা সংরক্ষণের আর সার্থকতা বা প্রয়োজন থাকবে না।

দেশবন্ধু দাশের এই ঘোষণায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বুনিয়াদ পর্যন্ত টলে



উঠেছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসী নেতাদের অধিকাংশ এ প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। দেশবন্ধু দাশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে একদল বলতে লাগল তিনি সুবিধাবাদী। আর-একদল বলল তিনি অন্যায়ভাবে মুসলমানদের পক্ষপাত করছেন। দেশবন্ধু দাশ এ সমস্ত নিন্দা-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নিজের মতে অটল থাকেন এবং সমস্ত বাংলাদেশ সফর করে দেশের হাওয়া বদলে দেন। তাঁর এই কার্যকলাপে কেবল বাংলাদেশে নয়, অন্য প্রদেশের মুসলমানকেও গভীরভাবে অভিভূত করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অকালে তাঁর মৃত্যু না হলে সমস্ত দেশে তিনি এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীরাই তাঁর সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে এবং ফলে তাঁর ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়। বাংলার মুসলমানের মনে সে সময়ে যে ধাক্কা লাগে তার ফলে তারা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। আমার মনে হয় যে এমনি করেই ভারত বিভাগের বীজ প্রথম রোপিত হল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা কিন্তু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। নীরিমানকে নেতা স্বীকার না করা বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষে অন্যায় হয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটি যে সে অন্যায় মেনে নিয়েছিল এও দুঃখের কথা। কংগ্রেসের এ এক বড় ভুল, কিন্তু এ ভ্রান্তির কথা ছেড়ে দিলে অন্যান্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই কংগ্রেস নিজস্ব আদর্শ মেনে চলেছে বললে অন্যায় হবে না। বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন হবার পরে সর্বত্রই কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুবিচার করবার প্রযত্ন করেছে এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথমবার কংগ্রেস দেশের শাসনভার চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এ পরীক্ষায় কংগ্রেস সত্যিকার জাতীয় রূপ বজায় রাখতে পারে কিনা তা দেখবার জন্য দেশের লোক বিশেষ উৎসুক ছিল। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিন্দা করে বলত যে কংগ্রেসের জাতীয়তা কেবলমাত্র লোক দেখানো, আসলে কাজে কংগ্রেস জাতীয় আদর্শ মেনে চলে না। কংগ্রেসের খালি বদনাম করেই লীগ তুষ্ট থাকেনি, লীগ জোর গলায় ঘোষণা করেছিল যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি নানা অবিচার ও অত্যাচার করছে। লীগ যে রিপোর্ট দেয় তাতে মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর জবরদস্তি এবং জুলুমের কথা বলা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি যে এ সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। বড়লাট এবং প্রাদেশিক লাটেরাও তদন্ত করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। ফলে লীগ যে রিপোর্ট পেশ করেছিল সমঝদার কোন লোকই তা স্বীকার করেনি।

কংগ্রেস যখন শাসনভার গ্রহণ করল তখন বিভিন্ন মন্ত্রিসভার কাজকর্ম দেখার এবং তাদের কর্মনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য একটি পার্লামেণ্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আমি বোর্ডের সদস্য ছিলাম। বাংলা, বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের পার্লামেণ্টারি কাজকর্ম আমিই দেখতাম। সাম্প্রদায়িক সমস্ত সমস্যা ও ঘটনাই তাই আমার নজরে আসত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি তাই বলতে পারি যে মুসলমান বা অন্য কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের যে-সব অভিযোগ মিস্টার জিন্না করেছেন সেগুলো সর্বৈব মিথ্যা। যদি এ সমস্ত অভিযোগের মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকত তাহলে সে অভিযোগ যেভাবেই হোক আমি দূর করতাম। প্রয়োজন হলে এ প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিতেও আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করতাম না।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পুরো দু-বছরও কাজ করবার সুযোগ পায়নি কিন্তু এই অল্প

সময়ের মধ্যেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ফয়সলা করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকের ঋণভার লাঘব এবং জনশিক্ষা প্রসারের জন্য যে আইন পাশ করা হয় তার বিশেষ উল্লেখ করা চলে।

জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ অথবা কৃষকের ঋণমোচন সহজ কথা ছিল না। তা নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়, অনেক কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল তারা যে প্রতিপদে কংগ্রেসকে বাধা দেবে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই। বিহারে জমিদারী-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং আমাকে ব্যক্তিগত-ভাবে এ সমস্যার সমাধানে হাত দিতে হয়। জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনার পরে যে নীতি আমরা অবলম্বন করি তাতে জমিদারদের আশঙ্কা দূর হয় অথচ কৃষকদের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

এ সমস্ত জটিল সমস্যার আমরা যে সমাধান করতে পেরেছিলাম তার একটি কারণ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে আমি কখনও যোগ দিইনি। স্বরাজ্য পার্টির আমলে পরিবর্তনবিরোধী ও পরিবর্তনপন্থী দলের মধ্যে কিভাবে আপোষ করেছিলাম সে কথা আগেই বলেছি। সে ঝগড়া এতদিনে মিটে গিয়েছিল কিন্তু শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর নতুন সংঘর্ষ দেখা দেয়। বলা হত যে দক্ষিণপন্থীরা কায়েমী স্বার্থের সমর্থক, বামপন্থীরা বৈপ্লবিক উদ্দীপনায় ভরপুর। দক্ষিণপন্থীদের যুক্তিযুক্ত ভয় বা সন্দেহকে আমি অস্বীকার করিনি কিন্তু আমার সহানুভূতি ছিল বামপন্থীদের দিকেই বেশি। দুই দলের মধ্যে আমি তাই আপোষ করতে পেরেছিলাম। আমার আশা ছিল যে বিনা দ্বন্দ্বে ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেস নিজের কর্মসূচী পূরণ করতে পারবে, কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় তা হয়ে উঠল না। নির্বাচনের সময় আমরা যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আন্তর্জাতিক শক্তির সংঘাতে ১৯৩৯ সালে তা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

[ ক্রমশঃ ]

[ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। বিনা অনুমতিতে পূর্ণত বা অংশত পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ। ]

কবিতা

# চীনা তর্জমা

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**

সূর্যাস্তেও চাপাবে উপরি রঙ!
শিশুর মুখেও সরলতা এঁকে বাড়াবে!
পাগড়ির পাক মাথায় মিথ্যে জড়িয়ে
প্রাণের জ্বালা কি সারাবে!

আর না, হৃদয়, আর না!
সদর রাস্তা ছাড়ো।
এখনো একটা মাঠ
খুঁজলে পেতেও পারো।

সেখানে কিছুই হয়না, কিছুই হয়না।
মেঘ করে আর হাওয়া দেয়, ঝরে বৃষ্টি।
ঘাসের ডগায় পতঙ্গ এসে বসে।
উড়ে চলে গেলে কাঁপে কিছুখন শিষ্‌টি।

কে জানে, হয়ত কে জানে
সেখানে মেলাবে ছন্দ,
তীর আর স্রোতে, থামায় চলায়
মেরু ও মরুর দ্বন্দ্ব।

# কুড়ানি

**যুবনাশ্ব**

॥ এক ॥

স্ফীত নাসারন্ধ্র, দুটি ঠোঁট ফেলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া,
"খাট্টাইশ, বান্দর, তরে করুম না বিয়া"।
এর থেকে মর্মান্তিক গুরুদণ্ডভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যানধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, দুচোখ ডাগর
এলো কেশ মুঠে ধরি দিলাম থাপড়।
রহিল উদ্‌গত অশ্রু স্থির অচঞ্চল,
পড়িল না এক ফোঁটা। বাজাইয়া মল
যায় চলি। স্বগত সক্ষোভে কহিলাম,
"যা গিয়া। একাই খামু জাম, সব্রি আম"।
গলিতাশ্রু, হাস্যমুখী, কহে হাত ধরি'
"তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী!"

॥ দুই ॥

পঞ্চদশী গৌরী আজ। দীঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
অনভ্যস্ত সমুস্থত লাবণি প্রকাশে
বিপর্যস্ত দেহা তন্বী। নিম্ন ওষ্ঠ পাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবীর,
সুদূর করেছে তারে, করেছে নিবিড়।
সান্নিধ্য সুদুর্লভ। তবুও সদাই
এ ছুতা ও ছুতা ধরি বিক্ষোভ মেটাই।
গাছের ডালেতে মাখি' কাঁঠালের আটা,
কখনো সখনো ধরি শালিখ, টিয়াটা।
কুড়ানিরে দিলে করে সিধা প্রত্যাখ্যান—
"আমি কি অখনো আছি কচি পোলাপান!"
অভিমানে ভরে বুক, পারিনা কসাতে
সেদিনের মত চড়, অথবা শাসাতে।



॥ তিন ॥

ছুটিতে ফিরিলে দেশে, কুড়ানি জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া কন্ "শোন মণি,
কুরানি উন্নিশে পরে, আর রাখি কত,
হৈয়া উঠছে মাইয়া পাহার পর্বত।"
"সুপাত্র দেখুম" কহি দিলাম আশ্বাস
চোরাচোখে মিলিল না দরশ-আভাস।
ম্লান মুখ, হত বাক, ফিরি ভাঙ্গা বুকে।
হঠাৎ শুনিনু হাসি, তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে "মা তোমার বুদ্ধিতো জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিস্‌রায় বর?"
হঠাৎ থামিয়া গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন।
মাতাল দখিণা বায়ু শাখা দুলাইয়া,
সব কটি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া!

# যে কথা

**বিষ্ণু দে**

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল মোলায়েম,
রোদের নীলায় ছায়া ফেলেছিল শতমেঘ
মৃদু মল্লার, জর্দা ফুলের কুঞ্জে
রাগ করেছিল অনেক নিকষ ভোমরা,
কথার অভাবে আমি গেলুম না সঙ্গে
যখন বাগানে দল বেঁধে গেলে তোমরা।

কখনও কখনও চোখে চোখ পেলে মনে হয়
সব চিরচেনা হল পলকের ভঙ্গে।

বেশ মনে আছে, তোমার চাউনি বরাভয়
তীক্ষ্ণ দুপুরে ছায়া মেলেছিল শতমেঘ,
খর মুহূর্তে আঙুল বিছালে মোলায়েম,
অথচ বাগানে যাই নি সবার সঙ্গে
অথচ তোমার খোঁপার আঁধার পুঞ্জে
খুঁজি নি ভোমরা, দাবিও করি নি কায়েম।

বেশ মনে আছে। তোমার মধ্য বয়সে
আজ বলা যায় দীর্ঘ চেনার রঙ্গে
যে কথা সেদিন বলতে পারি নি রভসে।
সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে
আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম?

# ভীরু

**হুমায়ুন কবির**

জীবনের দিন কেটে যায়
তবু স্বপ্ন নাহি ভাঙে।
উন্মুখ প্রত্যাশা ভরে
উদগ্রীব বসিয়া থাকি।
নাহি জানি
রুদ্ধশ্বাস এ প্রতীক্ষা কিসের লাগিয়া।
তবু বসে থাকি,
তবু চিত্ত ওঠে দুলে
না জানিয়া না বুঝিয়া আশা আকাঙ্ক্ষায়।

মাঝে মাঝে অকস্মাৎ ক্ষণিকের লাগি
মনে হয় পাইয়াছি,—
এতদিনে খোঁজা হল শেষ।
মনে হয় আপনারে ভুলি
মুহূর্তে ছড়ায়ে দিই ভুবন ভরিয়া
জীবনের সকল সঞ্চয়।
কৃপণের মতো দিনে দিনে
তিলে তিলে পথ গুনি গুনি
সন্তর্পণে সতর্ক এ চলা,
প্রতি মুহূর্তের লাগি দুঃসহ ভাবনা,—
তার ভার
চিরতরে দিই নামাইয়া।

কিন্তু চিত্তে নাহি বল
সাহস নাহিক মনে
জোর করে সব ভয় ভাঙি
তুচ্ছ করি হিসাব নিকাশ
নিঃশেষে ঢালিয়া দিই আপনারে জনমের মতো।

সন্দেহ সংশয়ে
চিত্ত ভরি লক্ষ লক্ষ নূতন ভাবনা
সর্প-শিশু সম জাগে।
করি আগু পিছু,

গনি ক্ষতি লাভ,
অকস্মাৎ মনে পড়ে মিথ্যা এ প্রয়াস—
দেবার মতন কিছু নাহিক জীবনে।

মুহূর্ত যে স্বপ্ন দেখেছিনু
মুহূর্ত যে ভেবেছিনু ধরণীতে দিব ঢালি দান
মুহূর্তের মরীচিকা মুহূর্তের শেষে
কোথায় মিলালো।
আবার অন্তর ভরি শূন্যতা কেবল,
কেবল বসিয়া থাকা
কেবল আকুল হয়ে দীর্ঘ রাত্রিদিন
প্রতীক্ষার পর গোনা॥

# বানপ্রস্থের পণ

**অন্নদাশঙ্কর রায়**

জবাহরলালকে দেখে মনে হয় না যে তাঁর বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এই চিরতরুণ যখন পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যান তখন নিজেকেই প্রৌঢ় বলে লজ্জা দিতে ইচ্ছা করে। যতবার তাঁর সান্নিধ্যে আসি ততবার ভাবি, আমারি বা এমন কী বয়স হয়েছে! আমিও তো তাঁর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি, তাঁরই মতো তরুণ থাকতে পারি।

কিন্তু জবাহরলালের চোখের দিকে তাকিয়ে অন্য রকম ভাব জাগে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার হলাহল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন তিনি। সে বেদনা, সে হতাশা, সে ক্লান্তি তাঁর চোখে আঁকা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাঁর চোখ হাসে। রসিক লোক। কৌতুক তাঁর স্বভাবে। কিন্তু গাম্ভীর্য ফিরে এলেই অমনি তাঁর চোখে নেমে আসে অপরিসীম বিষাদ, প্রগাঢ় ক্লান্তি। ভিতর থেকে অফুরন্ত প্রেরণা পাচ্ছেন বলেই তিনি দম না নিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। সে প্রেরণা একজন ইতিহাসনির্মাতার। যেমন লেনিনের। কিন্তু লেনিনকেও একদিন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকতে হলো। কাজ করতে চান, অথচ কাজ করতে পারছেন না। তেমন অবস্থায় বাঁচতে ইচ্ছা যায় না। মৃত্যু এসে মুক্তি দেয়। ইতিহাসনির্মাতারও দম নেওয়া দরকার। প্রকৃতির নিয়ম।

জবাহরলালকেও দম নিতে হবে। না নিলে লেনিনের মতোই শয্যা নিতে হবে। তাঁর সহকর্মীরা যদি এটা সময়ে না থাকেন তো তাঁদের মতো বন্ধুদের হাত থেকে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন। এই বিরাট দেশের দীর্ঘকালস্থায়িত বিবর্তন কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না, ক্রমেই বেগ সঞ্চয় করবে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। জবাহরলাল অন্তরে অন্তরে অনুভব করছেন সেই বেগের আবেগ। ধাবমান জনতার পুরোভাগে থাকতেই তাঁর মনোগত বাঞ্ছা। সুতরাং তাঁর বানপ্রস্থের পণ রাজা দশরথের মতো সিংহাসন ছেড়ে বনে যাওয়ার নয়। বনে গেলেও তিনি দম নিয়ে আবার লোকালয়ে আসবেন, সিংহাসনে ফিরে না গেলেও জনগণের পুরোভাগের সিংহ আসনে ফিরবেন। এখন তো জানা গেছে তিনি সিংহাসনেও ফিরবেন। ততদিন তাঁর খড়ম থাকবে ভারতবর্ষের ভরতদের রামভক্তির সাক্ষ্য দিতে।

তবে আমার মনে হয় না যে জবাহরলাল শুধু দম নিতেই চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত। রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি—বিশেষত জাতের বিচার—তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আদর্শবাদ এই কয়েক বছরে হাওয়া হয়ে গেছে। এর জন্যেও তিনি বিক্ষুব্ধ। এমনি অনেকগুলি কারণ তাঁকে বানপ্রস্থের পণ নিতে প্রবর্তনা দিয়েছিল। অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাঁকে নিবর্তনা দিয়েছে। সহকর্মীদের কাকুতিমিনতিও গণনার মধ্যে আনতে হয়। দেশের লোকের অনুরোধ উপরোধও।

আপাতত এ সংকটের অবসান হয়েছে। কিন্তু আপাতত। পরে যে কোনো দিন আবার জবাহরলাল প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতবর্ষের একজন সাধারণ প্রজা রূপে কাজ করতে চাইবেন। সেইজন্যে আরো গভীরে গিয়ে বিচার করতে হয় কোথায় তিনি বাধা পাচ্ছেন। কোন শক্তি তাঁকে ব্যর্থ করছে।

গত এগারো বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে নিঃসন্দেহ করেছে যে ভারতের স্বাধীনতা দৃঢ়মূল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে ভারতের সন্তানরা প্রাণ দেবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। ভারতীয়দের মধ্যে ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে দেশকে বহুখণ্ড করার খেলাও জমবে না। জনগণ তাতে ভুলবে না। ভারতে আজ এমন একটিও দল নেই যে নিজের প্রাধান্যের জন্যে দেশকে বিভক্ত করার কথা ভাবে। অবশ্য হিন্দীওয়ালাদের উপর রাগ করে অহিন্দীওয়ালারা অমন ভয় দেখিয়ে থাকে। সেটা ধর্তব্য নয়।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা যেমন দৃঢ়মূল সেক্যুলার স্টেট তেমন নয়। কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাইরে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা সেক্যুলার স্টেটকে নেহরুর একটা খেয়াল বলে উপহাস করেন। সেক্যুলার স্টেট তাঁদের চোখে মুসলিম তোষণ। শিখ তোষণ। নেহরু থাকতেই তাঁদের এই মনোবৃত্তি। নেহরু চলে গেলে যে সেক্যুলার স্টেট বিপন্ন হবে এটা আমার কাছে এখন পর্যন্ত ধ্রুব সত্য। তবে ইতিমধ্যে তাঁদের চিত্তপরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু এগারো বছরেও যা ঘটল না তার নিশ্চয়ই নিগূঢ় কারণ আছে। চিত্তপরিবর্তন তো ম্যাজিক নয়। যেখানে অন্তরকে অপ্রসন্ন করার মতো কারণ যথেষ্ট রয়েছে সেখানে ক্ষণকালের প্রসন্নতা কোনো কাজের নয়। সূত্রবাক্য কারণের অনুসন্ধান করা যাক।

ভারতেরই একাংশের নতুন নামকরণ হয়েছে পাকিস্তান। সেখান থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সে কথা ভোলেনি ও ভুলতে দিচ্ছে না। হয়তো ভুলত, কিন্তু এখনো বহু লোক আসছে। কোনো দিন যে আসার বিরাম হবে সে আশা রুমে লোপ পাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখে সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে জবাহরলালের মাথায়। সেক্যুলার স্টেটের ঘাড়ে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া যত দিন চলবে তত দিন পাকিস্তানী রাজনীতিকরা আর কোনো চাল খুঁজে না পেলে হিন্দু বিতাড়নের চাল চালবেনই। সেই ভাবে চাপ দেবেন জবাহরলালের উপর। তার পালটা চাল চালবেন ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। মুসলিম বিতাড়নের চাল। সেটারও চাপ পড়বে জবাহরলালের উপর। অথচ কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া দশ বিশ বছরে মেটবার নয়।

কেন মেটবার নয় তার একাধিক কারণ। একটা কারণ তো জলের মতো সোজা। কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গ হলে সেখান থেকে হিন্দুরা উর্ধ্বশ্বাসে পালাবে। সেইসব পলাতকদের কাহিনী শুনে ভারতের ক'জন হিন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারবে? যে ক'জনের মাথা ঠিক থাকবে সেই ক'জনেরই মাথা কাটা পড়বে। জবাহরলাল থেকে আরম্ভ করে আমার মতো অনেকের। দেশটা যদি নির্মস্তিক হয় তবে তাকে চালাবে কে? অরাজকতা থেকেই পরাধীনতা ঘটেছিল। আবার ঘটতে পারে।

সুতরাং পাকিস্তান যদি কাশ্মীর পেতে চায় তবে তাকে গ্যারাণ্টি দিতে হবে যে হিন্দুরা নিরাপদে বাস করবে, তাদের জীবিকায় ও সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হবে না, তাদের ধর্মে তো নয়ই। এ গ্যারাণ্টি শুধু কাশ্মীরী হিন্দুদের বেলা নয়, সিন্ধী হিন্দু, পাঞ্জাবী হিন্দু শিখ, বাঙালী হিন্দুদের বেলাও। যারা পালিয়ে এসেছে তাদের বেলাও। তার মানে দেশবিভাগের দরুন যার যা ক্ষতি হয়েছে সব পূরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য অনুরূপ গ্যারাণ্টি ভারতও দেবে। এ গ্যারাণ্টি যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্যে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নেওয়া হবে না। তৃতীয় পক্ষকে বেবাক বাদ দিয়ে দু'পক্ষের মধ্যেই পাকাপাকি নিষ্পত্তি করতে হবে। এক কথায় কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া তখনি মিটবে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া যখন মিটবে। বড় ঝগড়াটা হলো ধর্ম নিয়ে। তার থেকেই যত দুর্ভোগ। সেটা যদি না মেটে তবে তো দুর্ভোগের শেষ নেই।



ছোট ঝগড়াটা যে ভাবে মেটানোর চেষ্টা হয়েছে সে ভাবে মিটতে পারে না বলেই মেটেনি। কাশ্মীর যদি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভূস্বর্গ হয় তবে ভারতের সেক্যুলার স্টেট ধোপে টিকবে না। আর অরাজকতার ফলে দেশ আবার পরাধীন হবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রয়োজন হবে না। গৃহশত্রুরাই বহিঃশত্রুদের মালাচন্দন দিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে।

ধর্মহীন জীবন জীবনই নয়। অথচ ধর্মে ধর্মে বিবাদ মানুষের জীবনকে এমন দুর্বহ করেছে যে মানুষ এই ভূয়ো ধর্মযুগের আশু অবসান চায়। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। এটা আসলে মধ্যযুগেরই পুনরুজ্জীবন। আধুনিক যুগের মাঝখানে হঠাৎ এই মধ্যযুগীয় অধ্যায় আমাদের প্রগতিকে বহুপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। মনে হয় আরো দশ বিশ বছর এর আয়ু অবশিষ্ট আছে। তৃতীয় পক্ষ সমস্তক্ষণ অক্সিজেন জোগাচ্ছে। জেট বোমারু বিমানও সেই অক্সিজেনের সামিল। তৃতীয় পক্ষেরও মতি পরিবর্তন দরকার। মধ্যপ্রাচীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে ও ঘটবে তার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যযুগ আরো দ্রুত অপসৃত হবে হয়তো। আমরা তা বলে পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে পারিনে। সেক্যুলার স্টেটকে মজবুত করতে হলে যা যা করতে হবে তা করতে থাকব। তার থেকেই আসবে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা। নান্য পন্থাঃ। জবাহরলালের এটা খেয়াল নয়। আধুনিক যুগের এইটেই নীতি।

ভারতের মাটিতে জাতীয়তাবাদ যে পরিমাণ দৃঢ়নিবিষ্ট হয়েছে সেক্যুলার স্টেট সে পরিমাণ হয়নি। আর গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের মূল কত গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে?

গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়ানেওয়া, মাঝে মাঝে বাই-ইলেকশন লড়া, আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে মন্ত্রীমণ্ডল গড়া, অধিকাংশের সমর্থন হারালে পদত্যাগ করা, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে গণতন্ত্র আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরো দশ বিশ বছরে আরো সুদৃঢ় হবে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর ভাইমার রিপাবলিকও তো আমাদেরি মতো বহুপ্রশংসিত গণতন্ত্র ছিল। তা হলে হিটলার তাকে অত সহজে ডিকটেটরশিপে পরিণত করতে পারল কী করে? জবাহরলালের পরে তাঁরই মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অভাবে আমাদের গণতন্ত্র কি ঠিকমতো চলতে পারবে? যদি না পারে তা হলে কোনো একজন দেশী হিটলার এসে গণতন্ত্রেরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ক্ষমতার আসনে বসবে ও যে গাছের ডালে বসেছে সেই গাছকেই কেটে সাবাড় করবে, এটা বোধ হয় অহেতুক কল্পনা নয়। আসলে আমাদের গণতন্ত্রের প্রাণ নিহিত রয়েছে জবাহরলালের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অস্তিত্বে। সেইজন্যে চার্চিল সরে গেলে ইংরেজরা আঁধার দেখে না, নেহরু সরে যাবেন শুনলে আমরা আঁধার দেখি।

সত্যিকার গণতন্ত্রের মহিমা হলো এইখানে যে বিরাট একজন নেতা না থাকলেও ছোট ছোট নেতাদের টীম সমান গৌরবের সঙ্গে খেলে যায়। নেহরুর মতো মহান নেতা নিকট ভবিষ্যতে উদয় হবেন না, এটা আমরা স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি। তিনি যখন অমর নন তখন ছোট ছোট নেতাদের দিয়েই গণতন্ত্র চালিয়ে যেতে হবে। তাঁরা যদি লোকের শ্রদ্ধা না পান, যদি নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারেন, তা হলে গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রইলেও ভিতরে ভিতরে বল কমে আসবে। তখন কে একজন হিটলার এসে সর্দারতন্ত্র স্থাপন করবে। আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রকে এতখানি মূল্য দিতে শিখিনি যে তার জন্যেও প্রাণ দিতে পারি। তার জন্যে বড় জোর ভোট দিতে পারি। দেশের লোকের ধারণা একবার ভোট দিতে পারলে পাঁচ বছরের মতো সকলের সব দায়িত্ব চুকে গেল, তার পর যত কিছু দায়িত্ব জবাহরলালের মতো মহানেতার। কিন্তু তিনি না

থাকলে? তিনি না থাকলে ভেড ভেড করে কাঁদা যাবে। তার পর কোনো একজন মায়াবী হঠাৎ আবির্ভূত হলে তাকে মাথায় করে নাচা যাবে।

না, সত্যিকার গণতন্ত্র এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণ অত্যন্ত বেশী নেতৃনির্ভর। সর্দারতন্ত্রই এ দেশের ললাটলিখন, যদি না ছোট ছোট নেতাদের টীম যোগ্যতার সঙ্গে খেলতে অভ্যস্ত হয় ও লোকের আস্থা পায়। সময় থাকতে এর উদ্যোগ করতে হবে। নেহরু কি বুঝতে পারছেন না তাঁর পরে দুটিমাত্র সম্ভাবনা আছে? এক হলো ছোট ছোট নেতাদের টীমওয়ার্ক। আরেক হলো দেশী হিটলারের সর্দারি। গণতন্ত্রের প্রতি দরদ থাকলে তাঁরই তো কর্তব্য ছোট ছোট নেতাদের শিখিয়ে পড়িয়ে এমনভাবে মানুষ করে দেওয়া যে দেশের শাসন একদিনের জন্যেও দুর্বল বা বিশৃঙ্খল হবে না, পলিসি ভ্রান্ত হবে না, অগ্রগতি ব্যাহত হবে না। এ দিক থেকে চিন্তা করলে ভরতকে খড়ম ধরিয়ে দিয়ে কিছুকালের জন্যে বনে যাওয়াও বাঞ্ছনীয়। গেলে পাঁচ সপ্তাহ বা পাঁচ মাসের জন্যে নয়। বছর দুয়েকের জন্যে। তাঁর যদি সে পরিমাণ মনের জোর না থাকে তবে লোকের মনেও সংশয় থেকে যাবে যে নেহরুর পর দেশ হয়তো চলবে না। যারা দু'বছরও চালাতে পারে না তারা কোন দরের লোক? কে তাদের মানবে?

আরো ভাবনার কথা যে আমাদের জাতীয় ঐক্য নেতিবাচক। অর্থাৎ বাইরে থেকে আঘাত এলে আমরা এক হয়ে লড়তে পারি। কিন্তু তেমন পরাক্রান্ত শত্রু যদি না থাকে তবে আমরা শত ভাগে বিভক্ত হই। টীম গড়তে জানিনে। এই যে কংগ্রেস এও গড়ে উঠেছিল বহিঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজনে। এখন ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, তাই কংগ্রেসও তার ঐক্য রাখতে পারছে না। ঐক্য যেটুকু দেখছি সেটুকু ইংরেজ আমলের সংগ্রামী নেতাদের অস্তিত্বের কল্যাণে। ইতিবাচক ঐক্য কেমন করে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া চাই। শুধুমাত্র একটা প্রোগ্রাম কি একটা মহাজাতিকে সংহত করতে পারে, একত্ববোধ জোগাতে পারে? সংগ্রাম ও প্রোগ্রাম—শুনতে অনেকটা এক। কিন্তু ওজন সমান নয়। সংগ্রাম যতটা শক্তি সঞ্চার করে প্রোগ্রাম ততটা নয়। সেইজন্যে কংগ্রেসের বাইরে কয়েকটি দল সংগ্রামের উপরেই জোর দিচ্ছে। কেউ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, কেউ ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। এও নেতিবাচক ঐক্য। এদের ঘরেও একই সমস্যা দেখা দেবে। এরাও শত ভাগ হবে।

ইতিবাচক ঐক্য কেমন করে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও দু'বছর নিভৃতে ধ্যান করা দরকার। হৈ হৈ করে দেশময় ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়ানো বৃথা। গণসংযোগে আর যাই হোক এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। রুশ আর চীন সংগ্রাম করছে প্রতি মুহূর্তে, তাই তাদের মনে এ প্রশ্ন নেই। সংগ্রামের শেষে তাদের বেলাও এ প্রশ্ন উঠবে। আমরা তো সংগ্রাম করছিনে। আমাদের বেলা এ প্রশ্ন দিন দিন আরো জরুরি হবে। প্রোগ্রাম দিয়ে সংগ্রামের মতো সংহতি জাগিয়ে তোলা যায় না। রুশ-চীনের পঞ্চবার্ষিক যোজনা সংগ্রামের অনুরোধে। আমাদের তা নয়। মোট কথা জবাহরলালকে ভাবতে হবে। তাঁর অন্তরও সেই নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর দৌটানার অন্ত নেই। তাঁর বন্ধুরাও নাছোড়।

# এক গ্রীষ্মে দুই কবি

## বুদ্ধদেব বসু

দিনের পর দিন, বিরাম নেই। ক্ষমা নেই, বিরাম নেই, নিষ্ঠুর। আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙা মাত্র, একটা রাত পেরিয়ে গেলেও থামে না। সাতটা বেলা তিনটে বেলায় তফাৎ নেই, তফাৎ নেই মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রে। কিংবা, যদি বা থাকে, তা ধরা পড়ে শুধু নিশ্চেতন যন্ত্রে ও গণিতে, আমাদের ত্বকে বা ফুসফুসে তা অনুভূত হয় না। লোহিতসাগরের তাপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যবদ্বীপের আর্দ্রতা : এক ধূসর ও ধাতব আকাশের তলে কলকাতা মোহ্যমান। আরাম নেই স্নানে, তৃপ্তি নেই পানে, পরিধান দুঃসহ, নিজের দেহটা সুদ্ধ অস্থলীল হয়ে উঠেছে। পিঠের সঙ্গে মিনিটে-মিনিটে লেপটে যাচ্ছে গেঞ্জিটা; নামছে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, পাজামার তলায়, সারি-সারি কৃমির মতো। রাস্তায় আগুন, বারান্দায় হলকা, চুল্লির মতো বাথরুম; আর ঘরের মধ্যে কাহরানি ও গোঙানি। দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, একই রকম।

এ-রকম সময়ে ঈর্ষা করতে হয় গৃহপালিত কুকুরটিকে, যার বিকার নেই, নালিশ নেই, কোনো হেডলাইন অথবা প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্য পড়ে মেজাজের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা নেই; দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, যে পাথার তলায় ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে থাকে—সময়ের বাইরে, ইতিহাসের বাইরে, সাহিত্য নারী ও রাজনীতির প্রলোভনের অতীত। ঈর্ষা করতে হয়, করতেও পারি—কিন্তু তার বেশি আর-কিছু পারি না, কেননা আমাদের মন এই গ্রীষ্মের চেয়েও ক্ষমাহীন। তাই, যে ক'রে হোক, অন্য কোনো উপায় খুঁজে নিতে হয় আমাদের, বানিয়ে নিতে হয়, যার ফলে এই দিনগুলো ভ'রে শুধু স্বর্গত পিতামাতাকে অনর্থকভাবে স্মরণ করতে না হয়, যাতে এই ক্রেদময় দাহকে আমরা সহ্য করতে পারি—এমনকি, জয় করতে। আর সেই উপায়—যদি তাকে অর্ঘ্য ও অবিরাম হ'তে হয়, হ'তে হয় আমাদের মর্জির অস্থৈর্য থেকে মুক্ত—তাহ'লে মানুষের অভিধানে একটিমাত্র নাম আছে তার : কাজ। আমিও একটি কাজ বেছে নিয়েছিলুম, দিনের পর দিন, অবিরাম।

এমন একটা কাজ, যা প্রেরণার উপর নির্ভর করে না, যা কোনো মুহূর্তেই দৈবাধীন নয়, বলতে গেলে যা গাধার খাটুনি, অর্থাৎ, নীরস ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের সুযোগ দিয়ে যা মানুষের আত্মমর্যাদাকে বলীয়ান ক'রে তোলে। সৃষ্টির উন্মাদনা বা হতাশা নেই, আছে সংকলনকর্মের অমধুর সাধুতা। দুটো পাখা চলে ঘরের মধ্যে, দরজা-জানলা বন্ধ, দুটিমাত্র খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে নিস্তেজ আলো শাদা কাগজে; আর আমি ব'সে-ব'সে শার্ল বোদলেয়ারের একটি জীবনী-পাঞ্জি রচনা করছি। সম্পাদকের উপরোধ ঠেলে, উপার্জন মুলতুবি রেখে, এমনকি নিজের অনেক সংকল্পকে দূরে সরিয়ে—আমি ছুটছি আমার পক্ষে অতীব অরুচিকর সাল-তারিখের পিছনে, পথ হারিয়ে ফেলছি তথ্যের অরণ্যে, নাজেহাল হচ্ছি গ্রন্থসমূহের ওজনে এবং নিজের অসামান্য বিস্মরণক্ষমতায়।—কেন? এর ফলে কি বোদলেয়ারের কবিতা বিষয়ে নতুন কোনো অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি আমি? কি দেখতে পেয়েছি ইতিহাসের কোনো সূত্র? তা বলতে পারলে খুশি হতুম; কিন্তু আমাকে মানতেই হবে যে কবিতার সারাৎসার সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, এবং নিয়মহীনতাই ইতিহাসের নিয়ম।

অথচ এই ধ্বংসের শ্রম আমাকে কিছুই প্রতিদান দেয়নি তাও বলতে পারি না। শুধু যে গ্রীষ্মবোধ ভুলিয়ে রেখেছে তা নয়, মাঝে-মাঝে খিদে জাগিয়ে খাদ্যকে স্বাদু করেছে তাও নয়;—দিয়েছে উদ্দীপনার মুহূর্ত, আবিষ্কারের আনন্দ, গুপ্ত সংযোগ ও অনুল্লিখিত সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছে আমার সামনে, যার ফলে ইতিহাসের মানচিত্র অকস্মাৎ একটি ছবি হ'য়ে উঠেছে কখনো-কখনো। সত্য, এই সংযোগগুলি বৈধাধীন মাত্র; তবু তার কোনো-কোনোটি, কবিতার দুই চরণের মিলের মতোই, এমনই পরাক্রান্ত ও প্রতিধ্বনিময় যে তার পিছনে কোনো-এক সাভিপ্রায় স্রষ্টাস্থাপনের প্রলোভন প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এমনি একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করি : শার্ল বোদলেয়ার ও ফিওডর ডস্টয়েভস্কি একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন।

একই বছরে। নিতান্তই কাকতালীয়, তবু ভাবতে কি অবাক লাগে না? ভাবতে অবাক লাগে না যে আমাদের এই দীন গ্রহে যুগপৎ প্রেরিত হয়েছিলেন এমন দুই পুরুষ, যাঁদের জীবনের কাজ প্রচারিত হবার পর থেকে সেই কাজটির বিষয়ে ধারণা সমূল বদলে গেলো? বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা নতুন ধারণা আনেন পৃথিবীতে—বিশ্ব, অথবা ভগবান, অথবা সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে নতুন ধারণা; আর সে-সব ধারণা যে মূর্ত হবারও ক্ষমতা রাখে, তার প্রমাণ মানুষের প্রিয় অথবা ঘৃণ্য, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য, প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু একজন কবি— তিনি? কী তাঁর কাজ? কোথায় তাঁর ক্ষমতা? একজন বিজ্ঞানীর তুলনায়, এমনকি একজন দার্শনিকের তুলনায়, কী দরিদ্র তিনি, প্রায় শিশুর মতো রিক্ত ও দুর্বল; পাণ্ডিত্য নেই, নেই যুক্তির যাথার্থ্য বা তথ্যের স্পর্শসহতা; একটা নতুন ধারণাও নেই বেচারার তল্পিতে, এমন-কোনো চিন্তা নেই যা তাঁর আগে বহু কবি প্রকাশ ক'রে না-গেছেন। তাঁর পিচ্ছিল, বর্ণিল, অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট জগৎ থেকে মানবজাতিকে কোনো বাণী তিনি শোনাতে পারেন না, পারেন না উপদেশ দিতে, উপায় জোগাতে, কোনো সংকটে পথ ব'লে দিতে পারেন না। চরম যা পারেন তিনি, তা শুধু নিজেকে অবলম্বন ক'রে : নতুন ক'রে তুলতে পারেন শুধু নিজেকে, আর কাব্যকলাকে। ব্যাপারটার ওখানেই শেষ : কবিতা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে না, চাঁদে যাবার যান তৈরি হবে না, মানবজীবনে আর-কোনো প্রতিফলন হবে না তার। কবিতা নিজেই মূর্ত; মূর্ত না-হ'লে সে কবিতাই হ'লো না; দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে এখানেই তার দুস্তর ব্যবধান। ধারণার স্বভাব এই যে মূর্তিতে অনুদিত হবার প্রক্রিয়াটি তার মধ্যে অনিবার্যভাবে কিছু বিকৃতি ঘটায়, সঞ্চার করে কিছু কলুষ, কিছু অসংশোধনীয় ভ্রান্তি, যার ফলে বিবাহ, গণতন্ত্র বা শ্রেণীহীন সমাজের মতো মনোমুগ্ধকর ধারণাও প্রসব করে পঙ্গু অথবা জন্মান্ধ সন্ততি। এখানে বরং স্বনির্ভর ব'লে, কবিতার একটু সুবিধে আছে : যেমন জগৎকে বদলাবার তার শক্তি নেই তেমনি অন্য কিছুও পারে না তার বিকার ঘটাতে; সাংবাদিকতা, শতবার্ষিকী ও অধ্যাপকের আক্রমণ সত্ত্বেও যুগে-যুগে তার মৌল মহিমা প্রতিভাত হয়; অন্তত কোনো-কোনো অপ্রস্তুত পাঠক, প্রতি যুগে, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে তাকে, যেন এইমাত্র কবিতার জন্ম হ'লো, তার আগে কিছুই ছিলো না। বুকে তাঁর বিঁধলে যেমন হয় সে-অভিজ্ঞতাও তেমনি; তার সঙ্গে তর্ক চলে না, তা আমাদের উপযোগের অধীন নয়, আমাদের সেবা করে না সে, দখল ক'রে নেয়।

মনে হচ্ছে পাঠকরা উশখুশ করছেন, কোনো-একটা প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে চাচ্ছে। আমি কি দু-জন লেখকের নাম করিনি, আর তাঁদের মধ্যে একজন কি ঔপন্যাসিক নন?



কবিতাই যদি আলোচ্য তাহ'লে ডস্টয়েভস্কির স্থান হয় কেমন করে? না-দিলেও চলে, তবু বিশ শতকের প্রথা ও বাঙালি পাঠকের প্রতি সম্মানবশত এর জবাব দেবো। সংস্কৃতে, গদ্যপদ্যনির্বিশেষে, সংসাহিত্যের অভিধা ছিলো 'কাব্য'; আর জর্মন ভাষায় আজ পর্যন্ত 'ঔপন্যাসিকে'র কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই, ঐ ভাষাকে ও গুঢ়োন্বেষী জাতি ভাবতেই পারে না যে কোনো স্রষ্টা-লেখককে 'কবি' বা 'ডিখ্‌টার' ছাড়া অন্য কিছু বলা যায়। তাঁরা, যাঁরা মাঝে-মাঝে কবিতার স্পন্দন অনুভব ক'রে থাকেন, 'কবি' শব্দের এই ব্যবহারকে সমর্থন না-ক'রে পারবেন না; কেননা, যা বিধিবদ্ধভাবে কবিতা নয়, সেই গদ্যসাহিত্যেও অর্ফিয়ুসের বীণা তাঁরা শুনেছেন। বলা যেতে পারে, সাহিত্যের যা সারাৎসার তা-ই কবিতা; কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়; যা জীবনের মুকুরমাত্র না-হ'য়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে; বুদ্ধির অতীত এক দুর্গুলতায় নিক্ষেপ করে আমাদের, যেখানে বহু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, দ্যুতি ও ছায়া পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর এই অর্থে, এমন কোনো শিল্পকলা নেই যা কবিতার দ্বারা আক্রান্ত না হয়—সব সময় নয়, নিয়ম হিশেবে নয়, কিন্তু কখনো-কখনো। 'কবি লেওনার্দো', 'কবি চেহভ', 'কবি ভ্যান গ'—এ-সব কথা সহজেই আমাদের মুখে এসে পড়ে; কিন্তু 'কবি পস্যাঁ' বা 'কবি ভলতেয়ার' অর্ধোচ্চারিত না-হ'তেই আমরা থেমে যাবো। টমাস মান্ বা ডস্টয়েভস্কির মতো লেখককে 'কবি' আখ্যা দিতে নারাজ হবেন শুধু তাঁরাই যাঁরা গদ্য ও পদ্যের তফাৎ বুঝলেও গদ্য-মন ও কবি-মনের প্রভেদ বোঝেন না।

আলোচনার অন্য একটি স্তর আছে যেখানে, নাটক ও উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, আমরা বাধ্য হবো কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিশেবে চিন্তা করতে;—কিন্তু সেটা রূপ-কল্পের আলোচনা, সারবস্তুর নয়। যদি কেউ জিগেস করেন, 'রামায়ণ' গ্রন্থটি উপন্যাস না কাব্য, শেক্সপীয়র কবি না নাট্যকার, 'দি ডিভাইন কমেডি' কবিতা না উপাখ্যান, আমরা তার উত্তরে নীরব থেকে শুধু বলতে পারি যে আধুনিক কালে কবিতা নামক রূপকল্পের বিশেষ-যে-বিবর্তনটি ঘটেছে তা লিরিকধর্মী; পদ্য এপিক ও পদ্য নাটককে পুনর্জীবিত করার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পারিভাষিক অর্থে, কবিতা আজকাল লিরিকের নামান্তর বললে ভুল হয় না।—কিন্তু এখানে আমার উদ্দেশ্য অন্য; আমি চাচ্ছি সাহিত্য বা 'নেহাৎ সাহিত্য' থেকে কবিতাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিতে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক; ইতিহাস-, রাজনীতি- বা দর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থকে 'সাহিত্য' ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য আমরা; চলতি কালের উপন্যাস, চলতি কালের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক, রাষ্ট্রনেতার বক্তৃতাবলি—এগুলোকেও অমান্য করা যাবে না; এমনকি, যা-কিছু ভাষার দ্বারা রচিত হয়, বিজ্ঞাপন বা ব্যবহারিক নিবন্ধ, গো-পালন বা ব্যায়াম বিষয়ক পুস্তক, তাকেও 'সাহিত্য' হিশেবে গণ্য করায় অভিধানের ও লোকাচারের অনুমোদন আছে। তেমনি, 'শিল্পকলা' বা 'আর্ট' শব্দটিও সর্বজনীন; দার্জ বা রাধুনিও শিল্পী, রবি বর্মা বা ঈশ্বর গুপ্ত তা-ই, রুয়ো অথবা রিলকেও তা-ই। কিন্তু একটা জায়গায় সীমা টানতেই হয়; এমন একটা সময় আসেই, যখন সাহিত্য ও অসাহিত্য, বা শিল্প ও অশিল্পে যে-ভেদরেখা আমরা অনুভব করি অথচ অঙ্কিত করতে পারি না, তা জনমানসে লুপ্তপ্রায় দেখে আমরা আতঙ্কে ও উৎসাহে চীৎকার ক'রে উঠি—'ফেলে দাও "আর্ট"', "সাহিত্য" আর চাই না; কবিতা হোক!' আর এই ভাবনাই প্রবল হ'য়ে ওঠে মনের মধ্যে যখন বোদলেয়ারের সম্মুখীন হই আমরা, আর যখন ডস্টয়েভস্কির গদ্যকাব্যগুলিকে সহ্য করতে শিখি।

১৮২১ সাল, এই দু-জন যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ফ্রান্সে রোমান্টিকতার জন্ম হয়নি; পুশকিন, ফরাশি অনুবাদে বায়রন পাঠ করার পর, আধুনিক রুশ সাহিত্যের গোড়াপত্তন শুরু করেছেন। ইংলন্ড, রোমান্টিক মানসের মাতৃভূমি ও আধুনিক উপন্যাসের জন্মভূমি, পশ্চিমী সাহিত্যের নায়কত্বে অধিষ্ঠিত। নিঃসৃত হচ্ছে, একটির পর আর-একটি, ওঅল্টর স্কটের উপন্যাস, বায়রন 'ডন জুয়ান' লিখছেন, শেলির 'মুক্ত প্রমিথিয়ুস' প্রকাশিত হয়েছে। আর দশ বছরের মধ্যে প্যারিসের 'ড্যান্ডি'রা গ্রহণ করবেন ইংরেজি ভাবভঙ্গি, 'এর্নানি'র যুদ্ধে জয়ী হবে রোমান্টিকতার ফরাশি প্রকরণ, গ্যেটে মৃত, গোগোল প্রথম কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশ করবেন। কিন্তু, হায়, ততদিনে ইংলন্ডের ময়ূর আর চিতাবাঘেরা গত হয়েছেন, গৃহপোষ্য 'লন টেনিসন'কে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে। পরবর্তী অর্ধ-শতকে, ইংলন্ডের সাম্রাজ্য যে-অনুপাতে বিস্তার লাভ করলে, ঠিক সেই অনুপাতেই (এবং অংশত সেই কারণেই) নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো তার কবিতা ও সাহিত্য : স্ফীত বাণিজ্য, ঘরে-ঘরে সমৃদ্ধি, জগৎ জুড়ে 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা'—এই সব উপসর্গের ফলে ইংরেজ হ'য়ে উঠলো কূটনীতি ও অর্থনীতিতে বিশ্বনায়ক, এবং সাহিত্যে পাণ্ডুর। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও তার নৈতিক সমর্থনের আকাঙ্ক্ষা থেকে কবিরাও মুক্ত হ'তে পারলেন না ব'লে, প্রায় সত্তর বছর ধ'রে ইংলন্ডে একটা নতুন ভাবনা ভাবলে না কেউ, কোনো নতুন সুর যোজনা করলে না, ব্রাউনিঙের মতো বলিষ্ঠ মানুষও তাঁর বালিকা-নায়িকা পিপ্‌পার সঙ্গে মোটের উপর একমত হলেন যে 'স্বর্গে আছেন ঈশ্বর, আর জগতে কিছু ভুলচুক নেই।' এতেও হয়তো ক্ষতি ছিলো না; কিন্তু মারাত্মক কথা এই যে কবিতার বিষয়ে নতুন কোনো দৃষ্টি ছিলো না এঁদের; কবিতা বলতে শেলি বা ওঅর্ডস্বর্থ যা বুঝেছিলেন টেনিসন তা থেকে ভিন্ন কিছু বোঝেননি, ব্রাউনিংও না, এমনকি সুইনবার্ন, নতুন উপকরণ বিস্তর সংগ্রহ ক'রে থাকলেও, কবিতার ভাষাকে নতুন করতে পারেননি। সে-কাজ বাকি থেকে গেলো একজন আইরিশ ও দু-জন আমেরিকান আগন্তুকের জন্য। আর ইতিমধ্যে, সবীজ কবিতা স'রে এলো ফ্রান্সে, আর উপন্যাস রাশিয়ায়।

সময় কম, সংক্ষেপে বলতে হবে; অবহিত পাঠক মার্জনা করবেন। আমি উনিশ শতকের ফরাশি উপন্যাসকে ভুলে যাচ্ছি না, ডিকেন্সকেও মনে রেখেছি। কিন্তু কেউ কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে উনিশ-শতকী কথাসাহিত্যের যে-অংশ আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ, তার জন্মস্থল এমন এক দেশ যার কোনো 'ঐতিহ্য' ছিলো না, বলতে গেলে ইতিহাসও ছিলো না, য়োরোপের পূর্বদিগন্তে যে দেখা দিয়েছিলো মাত্র সেদিন? পরম একটি বিস্ময় : বিশ্বসাহিত্যে রাশিয়ার এই আকস্মিক ও প্রচণ্ড অভ্যুত্থান। কোনো ঐতিহ্য যে ছিলো না, সেটাই হয়তো শক্তি দিয়েছে তাকে; আঠারো শতকের শেষার্ধে 'বর্বর' জর্মানিও এমনি এক অমানুষিক প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত হয়। রাশিয়া, গ্রীক চার্চের অন্তর্ভূত ব'লে, অন্ততপক্ষে আরিস্টটলের 'কর্তার ভূত'কে এড়াতে পেরেছে; রেনেসাঁসের সঞ্জীবনী থেকে বঞ্চিত হ'লেও রচনাকর্মের সনাতন কোনো সংহিতা পায়নি; এবং শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা ও মন্ত্রোচ্চারণও আবহমান মাতৃভাষাতেই সম্পন্ন করেছে। ক্লাসিক আদর্শের প্রভাবমুক্ত এক বিস্তীর্ণ শূন্যতা—তা-ই যেন সহায় হ'লো তার; যে-মুহূর্তে ঘটলো বৈদেশিক সংস্রব, উনিশ-শতকী রোমান্টিক য়োরোপের অভিঘাত, সে-মুহূর্তেই তার বহুযুগসঞ্চিত কৌমার্য বিপুলভাবে সগর্ভ হ'য়ে উঠলো। অনুকরণেই আরম্ভ, কিন্তু প্রথম অনুকারক, পুশকিন, দৈবক্রমে নিজে ছিলেন প্রতিভাবান; মাত্র কয়েক



বছরের লেখকজীবনে রুশ সাহিত্যের বরফ তিনি গলিয়ে দিলেন, স্রোত শুরু হ'লো। যেমন তাঁর পিছনে বায়রন, তেমনি গোগোলের পিছনে ছিলেন হফমান্; কিন্তু ইংলন্ড ফ্রান্স ও জর্মানির কাছে রুশ লেখকদের প্রাথমিক ঋণ যেমন বিরাট, তেমনি উদার ও অব্যবহিত তার পরিশোধ। যা-কিছু তাঁরা নিয়েছিলেন ফিরিয়ে দিলেন তার অনেক বেশি; আর তা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, প্রায় হাতে-হাতে। জর্মানিতে শিলার ও গ্যেটের মতো, রাশিয়াতে একই সময়ে সক্রিয় হলেন ডস্টয়েভস্কি ও টলস্টয়; তার উপর, যেন রুশ মানসের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, আগত হলেন মিতাচারী, 'য়োরোপীয়' টুর্গেনিভ, আর সর্বশেষে বিষণ্ণ ও ক্ষমাসুন্দর আন্তন চেহভ। যখন, উনিশ শতকের শেষভাগে, এঁদের রচনাবলির অনুবাদ ফরাশি ও ইংরেজি ভাষায় দেখা দিতে লাগলো, তখন থেকেই স্রোতের গতি গেলো উল্টে; রুশীয় প্রভাব বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপ্ত হ'লো।

ঠিক এই দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই, উনিশ শতকের শেষার্ধের ফরাশি কবিতায়। য়োরোপের একটা পুরোনো প্রবাদ এই যে ইংলন্ড কবিতার দেশ, ফ্রান্স গদ্যশিল্পের, আর জর্মানি দার্শনিকতার। আর বস্তুত, আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে যে-সব কবি জন্মেছেন তাঁরা ফরাশি ঐতিহ্যের মধ্যে সুমহৎ হ'লেও বিদেশীর কাছে ধরা দেননি। যে-দুই পরস্পরবিরোধী ফরাশি শক্তি জগৎকে বদলে দিলে, সেই রুসো ও ভলতেয়ার দু-জনেই গদ্য লেখক। উগো, আমাদের কাছে, (হয়তো আজকের দিনে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছেও), তাঁর গদ্যকাহিনীর জন্যই স্মরণীয়, আর এই কথা গোতিয়ে-র পক্ষেও সত্য। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি বোদলেয়ার; তাঁরই সঙ্গে ফরাশি কবিতার দূরপ্রয়াণ; উনিশ শতকের পরবর্তী কবিতার তিনিই উৎসস্থল। এবং বিশ শতকেও আজ পর্যন্ত কোনো প্রধান কবি হননি যিনি তাঁর কাছে, কোনো-না-কোনো ভাবে, ঋণী নন। ভাবতে অবাক লাগে, একটু কৌতুকও বোধ হয়, যে যে-কালে ইংরাজি কবিতা স্বদেশচেতন টেনিসন ও সমাজচেতন চার্টিস্ট কবিদের দোটানায় মৃতকল্প, সে-কালেই, খালের ওপারে, কবিতাকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করছেন বোদলেয়ার, ভেরলেন ও র‍্যাঁবো, আর মালার্মে। যেমন বোদলেয়ারের পটভূমিকায় পাওয়া যায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব, তেমনি এবার, অবশেষে, ফরাশি হাওয়া এলো ইংলন্ডে; কিন্তু সে-বসন্ত যেমন ক্ষণিক, তেমনি বিহঙ্গবিরল। অস্কার ওয়াইল্ডকে মনে হয়, ইংরেজের রুটিনে-বাঁধা রাশভারি সপ্তাহের পরে, এক বাগানবাড়ির সপ্রমোদ ও ব্যয়বহুল শনিবার, আর পরবর্তী ক্লান্ত রবিবারটি যেন রমণীয় ও পাণ্ডুরোগী 'নব্বুইয়ের যুগ'। ইএটসের যৌবনের বন্ধুরা ভেরলেনের মতো নেশা করতেই শিখেছিলেন, কিন্তু দু-একটির বেশি ভালো কবিতা লিখতে পারেননি; এদিকে ওয়াটস-ডানটনের ঐকান্তিক ও সাধু প্রযত্নে সুইনবার্নের স্ফুলিঙ্গও নিবে গেছে। তত্রাচ, রাইমার্স ক্লাবের স্থাপনকালে ইএটস বুঝেছিলেন যে 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে, অর্থাৎ, লিখতে হবে বোদলেয়ার ও ভেরলেনের মতো।' শুধু বুঝেছিলেন তা নয়, এই ধারণাটিকে প্রয়োগ করারও চেষ্টা করছিলেন—ইংলন্ডের তৎকালীন কবিদের মধ্যে, শুধুই তিনি। তাই তাঁর পূর্ব-কবিতাতেও এডওঅর্ডীয় ম্লানিমা দেখা যায় না; আর সেইজন্যেই, শতকান্তিক হলদে রবিবারের পর ইংরেজি কবিতা শুধুমাত্র খোঁয়ারির ধূসর সোমবারে পর্যবসিত হ'লো না, তাতে নতুন প্রাণসঞ্চার করা ইএটসের সাধ্যে কুলোলো।

যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের যাত্রাস্থল, এমন দু-জন লেখককে, গদ্য ও পদ্যের বিভাগ অনুসারে, যদি আমাদের বেছে নিতে হয়, তাহ'লে, নিঃসন্দেহে, এই দু-জনেরই নাম করবো

আমরা : একজন 'ল্য ফ্লার দ্য মাল'-এর কবি, অন্যজন রাস্কলনিকভ, প্রিন্স মিশকিন ও কারামাজভদের স্রষ্টা। ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে টলস্টয়ের তুলনার প্রচণ্ড লোভ সামলে যেতে হচ্ছে আমাকে; শুধু এটুকু ব'লে স'রে যাবো যে টলস্টয় যেন বিরাট, প্রাচীন ও রহস্যময় এক বিগ্রহ, যার সামনে দাঁড়ালে ভক্তিতে ও ভয়ে আমাদের মাথা নুয়ে আসে, আর ডস্টয়েভস্কিকে দেখামাত্র আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব'লে উঠি—'দ্যাখো, এই যে মানুষ!' এই প্রভেদের জন্যই, না-বললেও চলে, আধুনিক কালে ডস্টয়েভস্কির আবেদন বেশি ব্যাপক ও তীব্র। 'আত্মার ঋষি' ও 'রক্তমাংসের ঋষি', 'সন্ত' ও 'দেবতা'—এই দু-জনকে বোঝাবার জন্য যে-সব তুলনা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই ইঙ্গিত আছে যে ডস্টয়েভস্কি আধুনিক মানুষের নিকটতর। বস্তুত, ডস্টয়েভস্কি ও বোদলেয়ার, পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'য়েও, পরস্পরের রচনা বিষয়ে অজ্ঞান থেকেও, যেন সহযোগীর মতো একটি কাজকেই সম্পূর্ণ ক'রে গেছেন : বিশ-শতকী আধুনিক সাহিত্যের ধারণাকে সৃষ্টি করলেন তাঁরা, বিশ-শতকী আধুনিক মানুষের পুরাণের জন্ম দিলেন।

দু-জনেই আঠারো শতকী যুক্তিবাদের শত্রু, উনিশ শতকী উপযোগবাদের বিদ্বেষ্টা, কোনো-এক গোপন অপরাধবোধে পীড়িত; 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'টিকে কোনো-কোনো স্থলে প্রায় 'ফ্লার দ্য মাল'-এর গদ্য টাঁকা ব'লে মনে হয়। মস্কোতে স্থাপিত সেও এক বোদলেয়ারীয় জগৎ; সংস্কারক সেখানে মূঢ়তার উদাহরণ, উন্নতির অর্থ নৈতিক অধঃপাত, এবং সাধুমাত্রেই সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। উভয়েরই নায়ক (মানে-এর ভাষায় অনায়ক বা অপনায়ক)—রুগ্ন, দুর্বল ও ইচ্ছাশক্তিহীন, মুমূর্ষু, শান্তিলোভী ও নিজের উপর প্রতি-হিংসাপরায়ণ। তাদের বাস লোকচক্ষুর অন্তরালে; তাদের জীবন ভাবনাময়; তাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বিতৃষ্ণা—বোদলেয়ারের বিখ্যাত সংলীন; অথচ প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্ন থেকে নিজেদের তারা ছিনিয়ে নিতেও পারে না। এবং উভয় কাব্যেরই রচনারীতি স্বীকারোক্তির বা স্বগতোক্তির; 'ভূতলবাসীর আত্মকথায় 'নায়কে'র নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি, কেননা 'ল্য ফ্লার দ্য মাল'-এর নিত্য-উপস্থিত 'আমি'র মতোই, এই ব্যক্তিও আধুনিক বিশ্বমানবের প্রতিভূ; এবং আধুনিক জগতের একটি লক্ষণ এই যে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বক্ষম ক'রে সে ব্যক্তির নাম পর্যন্ত মুছে দিতে চায়। ডস্টয়েভস্কির উত্তরসাধক কাফকার 'নায়ক'রাও শুধুমাত্র জোসেফ কে. নামে পরিচিত; আর যেখানে ভূতলবাসী ব্যক্তিটি পতঙ্গ পর্যন্ত হ'তে পারেনি, সেখানে কাফকার চরিত্রের অবাধে সেই রূপান্তর ঘটে। বিশ শতকের 'প্রগতি'র স্বরূপ বুঝতে হ'লে এই দুটিময় কাহিনীটিকে মনে রাখা চাই।

আকারে ছোটো হ'লেও, 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' তার লেখকের প্রায় সম্পূর্ণ একটি পরিচয়পত্র; সেখানে আমরা দেখতে পাই এক পীড়িত ও উৎপীড়িত শক্তি, এক দানোয়-পাওয়া উদাম, এক নগ্ন, প্রায় ছাল-ছাড়ানো মানবাত্মা, যা নৈয়ায়িক সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে গভীরতর খনি থেকে আতঙ্ক ও রত্ন ছেঁকে তুলছে। আর এই সব লক্ষণই আমাদের মনে পড়ে, যখন ডস্টয়েভস্কিকে স্মরণ করি। পুস্তকটির আর-এক বৈশিষ্ট্য তার আপাতিক বিশৃঙ্খলা, যা, সন্দেহ নেই লেখক সচেতন ও চতুরভাবেই সাজিয়েছিলেন। 'শুধু নিজের জন্য' লেখা এই আত্মকথায় শ্রোতৃরূপী 'ভদ্রমহোদয়গণে'র উল্লেখ কিন্তু পৌনঃপুনিক; কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম খণ্ডটি এক দীর্ঘায়িত ও প্রোজ্জ্বল বিতর্ক; দ্বিতীয় খণ্ডের ক্ষীণ কাহিনীটুকু, যেন আকস্মিকভাবে উত্থাপিত হ'য়ে, স্বগতোক্তির খরস্রোতে কিছুটা দীনভাবে ডুবে গেলো। উপন্যাসরচনার যা-কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, তার প্রত্যেকটিকে এই



গ্রন্থে লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে বোদলেয়ার যেমন মুক্তি দিয়েছিলেন কবিতাকে, ক্রমশ বর্জন করেছিলেন বর্ণনা ও অভিমত, শুভেচ্ছা ও ভবিষ্যদ্বাণী, তেমনি এই গ্রন্থেও গতানুগতিক উপন্যাসের কোনো উপাদান আমরা দেখতে পাই না—না প্লট, না ঘটনা, না বিভিন্ন রসের পরিবেশন, এমনকি চরিত্রচিত্রণও নয়। বইটির আকর্ষণ একমাত্র মনস্তত্ত্বের : একটি মানুষ, যার নাম পর্যন্তও আমরা জানলাম না, তার মনের গূঢ়তম দ্বন্দ্ব ও রহস্য জেনেও আমাদের মনে হয় আরো বাকি থেকে গেলো। আমরা আবার পড়তে লুব্ধ হই, কিন্তু হয়তো একটি অংশ প'ড়েই তুলে রাখি—যেমন কিনা একজন কবির একটি রচনাই যথেষ্ট মনে হয় এক-এক সময়, আরো প'ড়ে সেই একটির প্রভাব হারাতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ, কথাসাহিত্য কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে কী-রকম ভাবে বদলে যেতে পারে, 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' তারই একটি প্রাথমিক ও স্থায়ী উদাহরণ।

জানি, ডস্টয়েভস্কির অন্যান্য রচনায় এ-সব লক্ষণ সর্বত্র ও সর্বতোভাবে পাওয়া যায় না। জটিল ও জমকালো প্লটরচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই তা নয়, বরং অনেক সময় উদ্ভাবেই তা ধরা পড়ে; প্রতি পরিচ্ছেদে পাঠককে চমকে দিতেও চান; এমনকি চেষ্টা করেন মিসেস র‍্যাডক্লিফের মতো অস্ভুত ও লোমহর্ষক উপাদান একত্র করতে। কিন্তু, সব চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর হাতে প্লট জমে না, একাভিমুখী হ'তে পারে না কাহিনী—নিরন্তর সংকটের আবর্তে ঘূর্ণিত হ'তে থাকে তাঁর কুশীলবেরা, যাদের আমরা আহার করতে দেখি না কখনো, কোনো কাজ করতেও অল্পই দেখি, যারা অবিরাম শুধু বলে, বলে, কথা বলে, যেন প্রত্যেকেই, 'ভূতলবাসী' ব্যক্তিটির মতো, স্বীকারোক্তির দায়িত্বে ভারাতুর। মহৎ সাহিত্য, শ্লেটো-বর্ণিত প্রেমের মতোই, অনেক সময় হীনজন্মা হ'য়ে থাকে। যে-সব উৎস থেকে বোদলেয়ার আহরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রধান হ'লো 'শ্মশানসাহিত্য', তাঁর বাল্যে প্রখ্যাত ও অচিরে বিস্মৃতে এক লেখকগোষ্ঠীর রচনাবলি—যা হত্যা, আত্মহত্যা, শব ও কবরের উল্লেখ না-ক'রে এক পংক্তি অগ্রসর হ'তো না। ডস্টয়েভস্কিরও, মানতেই হবে, অন্যতম উত্তমর্ণ ইংরেজি ভাষার বিভীষিকাময় 'গথিক' উপন্যাস। কিন্তু তিনি যখন চাইতেন একটি লোমহর্ষক রচনা লিখতে, তা হ'য়ে উঠতো 'দি ডাবল্' (বা 'দুই আমি')-র মতো কোনো কাহিনী, মানুষের দ্বিত্ব-বোধের এক সূতীক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সব উপাদান গ'লে যায় তাঁর ভাবনার তাপে, বস্তুর স্পৃশ্যগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়, চরিত্রগুলি হ'য়ে ওঠে আতিকায় ও দ্বিরায়তনিক, ঘটনার ইন্ধনকে ভস্মীভূত ক'রে জ্ব'লে ওঠে এক চিন্ময় ও দুঃসহ অনল। তেমনি, হত্যা ও মৃত্যু নিয়ে বোদলেয়ার যে-সব কবিতা লিখেছেন তাতে এই কথাটি ধ্বনিত হয়েছে যে অমৃতে ভিন্ন তৃপ্তি নেই মানুষের, আর যেহেতু অমৃতের অভিজ্ঞতা—প্রেম, কবিতা বা মদিরার সাহায্যে প্রাপ্য হ'লেও—মরজীবনে ক্ষণিক ও খণ্ডিত হ'তে বাধ্য—তাই মানুষের দুঃখেরও অবসান হ'তে পারে না। মিসেস র‍্যাডক্লিফ বা পেত্রাস বরেল প'ড়ে আজও আমাদের গায়ে কাঁটা দিতে পারে, কিন্তু পড়ার শেষে আমরা যা ছিলাম তা-ই থেকে যাই; আর বোদলেয়ার বা ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে আমরা নতুন একটি ব্যক্তিত্ব লাভ করি। অর্থাৎ, নিছক ইন্দ্রিয়রগত সংবেদনকে তাঁরা রূপান্তরিত করেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায়।

আমি ভুলিনি, এই দুই লেখকের মধ্যে কোনো-কোনো বিষয়ে প্রভেদও দুস্তর। ডস্টয়েভস্কির গঠনশক্তি ছিলো না, রেখা ও ঘনতার বিতরণ বুঝতেন না তিনি;—চিত্রকর হ'লে বলা যেতো তিনি অঙ্কনবিদ্যায় অজ্ঞ আর বর্ণলেপনে প্রতিভাবান। এইজন্যেই তাঁর রচনাকে টুর্গেনিভ একবার বলেন 'ব্যাধির দুর্গন্ধময় প্রলাপ', আর টুর্গেনিভ-ভক্ত হেনরি

জেমস 'গ'লে-যাওয়া পুডিং' ব'লে উড়িয়ে দেন। সমকালীন পাঠকদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এও 'ব্যাধির দুর্গন্ধ' ছাড়া আর-কিছু পাননি; কিন্তু এই কবি যে নিখুঁত রূপকল্পের পূজারি, মানসতায় রোমান্টিক হ'য়েও কারুশিল্পে ক্লাসিকধর্মী, তা সহজীবী সাহিত্যিকরা বুঝতে পারেননি তা নয়। 'ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিটি সম্ভবপর মিল যে না জানে সে-ব্যক্তি কোনোপ্রকার ভাবপ্রকাশে অক্ষম', এই একটি মন্তব্যেই বোদলেয়ারের কাব্যধর্ম আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু দুই খণ্ড 'লেখকের ডায়েরি' প'ড়ে আমরা জানতে পারি না যে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিষয়ে ডস্টয়েভস্কি কখনো কিছু ভেবেছিলেন। ঐ গ্রন্থ তাঁর উত্তরজীবনের রচনা; সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় আলোচনায় ভারাক্রান্ত; তখন তিনি য়োরোপীয়তা পরিহার ক'রে পুরোপুরি শ্লাভ হ'য়ে উঠছেন, স'রে আসছেন সনাতনী মন্দির ও জাতীয়তাবাদের সন্নিকটে, গণকল্যাণের ভাবনাও আর এড়াতে পারছেন না। এর উল্টো দিকে বোদলেয়ারের বিবর্তন। ১৮৪৮-এর ক্ষণিক উন্মাদনার পর যে-কোনো প্রকার জনসংঘ বিষয়ে তাঁর আস্থা ভেঙে যায়; ফ্রান্সে তিনি বিরক্তিবোধ করেন সে-দেশে 'সকলেই ভলতেয়ারের মতো ব'লে'; এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে 'একমাত্র সার্থক প্রগতি' হ'লো তা-ই যা মানুষ তার নিজের মধ্য থেকে আত্মিকভাবে ঘটাতে পারে। দু-জনের মানসতার তফাৎ একটি উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। জর্জ সাঁ, যাঁকে বোদলেয়ার 'বিষ্ঠাগারে'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তাঁর নায়িকাদের মধ্যে ডস্টয়েভস্কি দেখেছিলেন সব রকম নৈতিকগুণের সন্নিপাত।

অথচ, বাংলা প্রবচনের ভাষায়, দু-জনকে যে এক দেবতা গড়েছিলেন সে-বিষয়েও সন্দেহ রাখা অসম্ভব। একটি মহৎ যোগসূত্র বেঁধে রেখেছে এঁদের; দুঃখসাধনায় যমজ ভাই যেন এঁরা; কবিদের মধ্যে এঁরাই প্রথম, যাঁরা দুঃখকে একটি মূল্যরূপে উপলব্ধি করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দুঃখ ছিলো বিধিলিপি, বা কর্মফল, বা ঈর্ষাপরায়ণ দেবতার প্রতিহিংসা; অন্ততপক্ষে তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব ছিলো—হয় নরকে, নয় জন্মান্তরে, নয় তো বা সন্তানের উত্তরাধিকারে। দান্তে নরকের পাপীদের করুণা করেন, কিন্তু তাঁদের জন্য দায়ী বোধ করেন না; শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক নায়কেরা, কতিপয় গৌণ ও সৎ ব্যক্তির হাতে জগতের ভার তুলে দিয়ে, নিজেরা অপগত হন। পূর্ব-রোমান্টিকেরা দুঃখ বিষয়ে লিখেছিলেন অনেক, কিন্তু তাঁদের কাছে তা ছিলো একটি প্রতিকার্য অপলাপ, বা একটি 'স্খলন', যা ভালো আইন ও সামাজিক সংস্কার দ্বারা চিকিৎস্য। শেলির প্রমিথিয়ুসের কষ্ট অনেক, কিন্তু বিলাপ আরো বেশি ব'লে আমরা তার জন্য দুঃখবোধের অবকাশ পাই না; তার সান্ত্বনাদাত্রী বহু; সারা বিশ্ব তার মুক্তির জন্য সচেষ্ট। এরই সহযাগী ছিলো বায়রনী বিষাদ, 'শতাব্দীর ব্যাধি', নিঃসঙ্গতাবোধ, সমাজের প্রতি বিবমিষা; আর বোদলেয়ারের যাত্রাস্থল এখান থেকেই। কিন্তু দুষ্ট সমাজ থেকে পলায়ন সম্ভব, সম্ভব ডন জুয়ানের মতো বিদ্রোহ, কিংবা তাকে ভেঙে দিয়ে নতুন পৃথিবী রচনা করার প্রলোভনও নিত্য উপস্থিত। বোদলেয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে এই সম্ভাবনাগুলির একটিকেও তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর নিজের 'ঝটিকাদীর্ণ যৌবন' তাঁকে যে-অভিজ্ঞতা এনে দেয়, ডস্টয়েভস্কি তা লাভ করেছিলেন উনিশ-শতকী রাশিয়াতে জন্মেছিলেন ব'লেই। আলেকজেণ্ডার রাডিশেভ, এক রুসো-ভক্ত রুশ লেখক, ১৭৯০ সালে 'পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো' নামে এক ভ্রমণকাহিনীতে লেখেন: 'চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি, আর মানবজাতির দুঃখে আমার আত্মা বিদীর্ণ হ'লো।' একজন সমালোচক বলেছেন যে এই বাক্যটি রচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে জন্ম নিয়েছিলো রুশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। প্রথম থেকেই, রুশীয় সাহিত্যে দুঃখ একটি বিরাট স্থান অধিকার করেছে;



তার ধারা আরম্ভ হয় গোগোলেই, যিনি রুশ গদ্যসাহিত্যের আদিপিতা, ও ডস্টয়েভস্কির প্রত্যক্ষ গুরু। কিন্তু এখানে যে-কথাটা উল্লেখ্য তা এই যে, বোদলেয়ার যেমন বায়রনী বিষাদে এক গভীরতর অর্থ সঞ্চার করেন, তেমনি ডস্টয়েভস্কির হাতে রুশীয় দুঃখের এক রূপান্তর ঘটেছিলো।

দু-জনে প্রায় একই সময়ে একই আবিষ্কার করেছিলেন। বুঝেছিলেন, দুঃখ এমন জিনিশ নয় যা শুধু বাইরে থেকে আঘাত দেয়, তা মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। বুঝেছিলেন, দুঃখ দূর করার চেষ্টার দ্বারা কিঞ্চিৎ আশু উপশম হ'লেও শেষ পর্যন্ত দুঃখকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়; যে দুষ্ট সমাজ থেকে শারীরিক অর্থে পলায়ন সম্ভব হ'লেও আত্মার কলুষ থেকে মুক্তি দুরূহ; যে বিদ্রোহও এক প্রকার নতিস্বীকার; যে মানবসমাজে অবিরাম ভাঙাগড়া চললেও পৃথিবীতে কখনো স্বর্গরাজ্য আসবে না, শুধু এক অবিচার থেকে অন্য অবিচারে পৌঁছনো যাবে। কিন্তু তাহ'লে? তাহ'লে মানুষের কি কিছুই করবার নেই?

আশ্চর্য এই যে এই প্রশ্নেরও ঠিক একই উত্তর রেখে গেছেন দু-জনে। এবং সে-উত্তর রাজনৈতিক বা সমাজতত্ত্বজ্ঞের নয়, কবির, এবং আধুনিক কবির। 'এডগার পো,' বোদলেয়ার একবার লিখেছিলেন, 'সেই আধুনিক কবিদের একজন, যাঁরা আমাদের সকলের হ'য়ে দুঃখভোগ করেছেন।' পো-র বিষয়ে অল্পই তিনি জানতেন তখন, কথাটা আসলে তাঁর নিজের বিষয়েই বলা—অর্থাৎ, 'কবি' বলতে তিনি যা বোঝেন সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে ওতে। অন্যেরা প্রতিকার করুন দুঃখের, ত্রাণ করুন জগৎকে; কবির কাজ সকলের হ'য়ে দুঃখভোগ করা, তাঁর পরিচয় সকলের সব দুঃখের জন্য একটি বিশুদ্ধ ও নির্মল দায়িত্ববোধে। এই দায়িত্ববোধের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ প্রিন্স মিশকিন; তাঁর চরিত্র স্পষ্টত যীশুকে মনে করিয়ে দেয়; কিন্তু মস্ত তফাৎ এই যে প্রিন্স মিশকিন, তাঁর দারুণ সাধুতা নিয়ে, তাঁর অব্যবহিত পারিপার্শ্বিককেও এক তিল বদলাতে পারেন না। তিনি যে সকলের হ'য়ে দুঃখ পান সেটাই তাঁর পুণ্য; রিলকের মাল্‌টে লাউরিড্‌জ্‌ ব্রিগ্‌গে-র মতো, বা 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস স্‌প্লীনে'র প্রণেতার মতো, তিনি ভিখারি, বেশ্যা, মাতাল, উন্মাদ ও সব রকম পীড়িত ও পতিতজনের অন্তরতম স্থলে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু কাউকেই শোধন করতে পারেন না। অর্থাৎ, তিনি ত্রাতা নন, তিনি কবি।

উপরন্তু, যেন জগতের সামনে উদাহরণ স্থাপন করার জন্য, এই দু-জন তাঁদের জীবনকেও দুঃখময় ক'রে তুলেছিলেন। বোদলেয়ার, টমাস মান্‌-এর 'ফাউস্টে'র মতো, অল্প বয়সেই অর্জন করলেন উপদংশ রোগ, যা খুব বেশি দেরি না-ক'রে তাঁকে বিনষ্ট করবে। 'শিশু-প্রেমের সবুজ স্বর্গ' ভেঙে গিয়ে তাঁরা বিধবা মাতা আবার বিবাহ করলেন; সাবালক পুত্রকে অভিভাবকত্বের অধীন ক'রে জুগিয়ে দিলেন জীবনব্যাপী দারিদ্র্য ও অসম্মান। আর ডস্টয়েভস্কি হলেন মৃগীরোগী, সহ্য করলেন প্রজাদের হাতে পিতার নিধন, ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ ক'রে মুক্তি পেলেন শেষ মুহূর্তে, ভোগ করলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসন তারপর দারিদ্র্য ও পত্নীর রুগ্নতা। কৃতী পুরুষ বিপিতাকে বোদলেয়ার যেমন শ্রদ্ধাও করেছেন আবার সহ্য করতেও পারেননি, তেমনি ডস্টয়েভস্কিরও চিরন্তন গলগ্রহ ছিলো তাঁর পত্নীর প্রথম পক্ষের এক নিষ্কর্মা যুবকপুত্র। এই সবই মনে হ'তে পারে আপতিক, বহিরাগত দুর্ঘটনা মাত্র, আর এ-কথা কখনোই সত্য নয় যে ঘটনাবহুল জীবন হ'লেই রচনার সমৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু, পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে, এঁরা দু-জনেই নিজ-নিজ দুঃখকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন—যেমন কোনো-কোনো প্রাণী কোনো বিশেষ বিষকে ক্ষরণ করে তার দেহের মধ্যে—দুঃখভোগের

কোনো সুযোগ তাঁরা হারাননি, তা পাবার জন্যে যত্ন নিয়েছেন রীতিমতো, অবস্থা ভিন্ন হ'লেও স্বীয় জীবনকে এমনিভাবেই রচনা ক'রে নিতেন তাঁরা। অভিভাবকত্বের শরশয্যায় শুয়ে, বোদলেয়ার শুধু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন, চিঠিপত্রে উদ্বেল ক'রে তুলেছেন আক্রোশ, কিন্তু ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোনো সত্যিকার চেষ্টা কখনো করেননি। 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর মামলার সময়েও, সরকারি উকিলের বাগ্মিতা তিনি বাণবিদ্ধভাবে শুনে গেলেন শুধু, একবার আত্মসমর্থনের চেষ্টা করলেন না। তাঁর 'বিচারক'দের সঙ্গে গোপন মনে তিনি যেন একমত, যে-সব প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধ তাঁর পরম ঘৃণ্য তাকে কার্যত যেন শ্রদ্ধা না-ক'রেও পারেন না। পাছে সুখী হন, যেন সেই ভয়েই মাদাম সাবাতিয়ে-র প্রণয়াঞ্জলি প্রত্যাখ্যান করলেন; সুখশান্তির আশা নেই জেনেও—বা সেইজন্যেই—জ্বান দ্যুভালকে ত্যাগ করতে পারলেন না। প্রথম যৌবনে আর্থিক অবস্থা যখন ভালো ছিলো তখনই, এক নির্বিবেক চিত্রবণিকের চক্রান্তে, ঋণজালে আবদ্ধ হন; নিজেকে প্রতারিত জেনেও, জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই ঋণ অস্বীকার করেননি; আর যখন নিজের আহার জোটে না তখনও মিথ্যাচারিণী জ্বান দ্যুভালকে খরচ জুগিয়েছেন। মনে হয়, তাঁর জীবনে সবচেয়ে জরুরিভাবে যার প্রয়োজন ছিলো, তারই নাম দুঃখ। আর এই কথা কি ডস্টয়েভস্কির বিষয়েও সত্য নয়? বার-বার তিনি কি জুয়োতে সর্বস্বান্ত করেননি নিজেকে, কেননা পিঠের উপর দারিদ্র্যের চাবুক না-পড়া পর্যন্ত কিছুতেই তাঁর কলম চলবে না? মৃতা পত্নীর পুত্রকে, তার পরাশ্রয়ী স্বভাব বুঝেও, প্রায় গায়ে প'ড়েই কি পোষণ করেননি আজীবন? গ্রহণ করেননি, নিজ ঋণের যাতনা সত্ত্বেও, মৃত ভ্রাতার ঋণভার ও তার পরিবারপোষণের দায়িত্ব? শুধু তা-ই নয়, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে একবার নালিশ করেননি, পরেও কখনো বলেননি যে সম্রাট তাঁকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়েছিলেন। বরং, যে-অপরাধ করেননি তাও তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন; পিতার হত্যা যেন তাঁরই স্বকৃত, এই বোধ তাঁর অবচেতনকে ক্লিষ্ট করেছে; এমনকি, একবার এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে যৌবনে এক বালিকাকে তিনি ধর্ষণ করেন। এই কাহিনীটি রচিত; নিজের বহু কুকীর্তি বানিয়ে-বানিয়ে রটনা করা বোদলেয়ারেরও অভ্যাস ছিলো। স্বনির্যাতন, সন্দেহ নেই, দু-জনেরই ছিলো স্বভাবসিদ্ধ; দু-জনেই ছিলেন একাধারে 'বধ্য ও ঘাতক, বিক্ষত মাংস ও ছুরিকা।'

আর এইভাবে, কবির বিষয়েও একটি নতুন ও আধুনিক ধারণা এঁরা উপহার দিয়ে গেছেন পৃথিবীকে। আর ত্রাতা নন, প্রবক্তা নন, নন 'মানবজাতির অস্বীকৃত বিধানকর্তা'; এঁদের মধ্য দিয়ে কবি হ'য়ে উঠলেন শিল্পের শহীদ, সবচেয়ে সচেতন মানুষ, নিজের চৈতন্যের অনলে যে অবিরল নিজেকে দগ্ধ করে, এবং নিজের সৃষ্টি ছাড়া আর-কিছুই রেখে যায় না। যে-সব বহুমান্য প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে আমরা দৈনিক জীবন যাপন ক'রে থাকি, তা থেকে বহু-দূরে তাঁর অবস্থান; তাঁর সাধ্য নেই আমাদের কোনো সুখ অথবা প্রমোদ জোগাতে পারেন; তাঁর অবদান একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এ-কথা সহজেই বোঝানো যায় যে, আমাদের এই বহুনিন্দিত বিশ শতকে, সাহিত্য ও শিল্পকলা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠেছে; ত্যাগ করেছে বস্তুর মোহ, প্রতিচিত্রণের সরল আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষাদান, সংবাদসেবন বা কৌতূহল-নিরসনের দায়িত্ব। এবং এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতার যাঁরা জনক, সেই দুই পুরুষকে, শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে, আমাদের এই গ্রীষ্ম এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য থেকে, আমরা দ্রষ্টা, দিশারি ও আত্মীয়রূপে বরণ করি।

# অচেনা

## আলবেয়ার কাম্যু

মা আজ মারা গেছেন। কিংবা গতকালও হতে পারে, আমি ঠিক জানি না। টেলিগ্রাম যা পেয়েছি তা এই, "তোমার মা গত হয়েছেন। কাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। গভীর সহানুভূতি।" ব্যাপারটা তাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, এমনও হতে পারে যে মা গতকালই মারা গেছেন।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আতুর আশ্রমটা মারেংগো-তে, অ্যালজিয়ার্স থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। দুটোর বাস ধরলে রাত হবার বেশ আগেই সেখানে পৌঁছে যাব। তা হলে রাতটা সেখানে কাটিয়ে যথারীতি শবদেহ নিয়ে জাগার কর্তব্যটা সারতে পারি আর তারপর আগামী-কাল সন্ধ্যার মধ্যে এখানে ফিরে আসাও সম্ভব। মনিবের কাছ থেকে দুদিনের ছুটির বন্দোবস্ত করেছি। এ অবস্থায় ছুটি দিতে আপত্তি তিনি করতে পারেননি, কিন্তু একটু বিরক্ত হয়েছেন বলেই মনে হল। কিছু না ভেবেই আমি তখন বলেছিলাম, "দেখুন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন এতে আমার কোনো হাত নেই।"

পরে আমার মনে হয়েছে কথাটা ওভাবে না বললেই পারতাম। আমার তো কৈফিয়ত দেবার কোনো দরকার ছিল না; তাঁরই সহানুভূতি ইত্যাদি জানাবার কথা। হয়তো গতকালের পর আমার শোকের কালো পোশাক দেখে তিনি তা জানাবেন। আপাতত মা যেন ঠিক এখনো মারাই যাননি বলা যায়। শেষকৃত্য হলে ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে পারব। ঘটনাটায় যাকে বলে সরকারী ছাপ পড়বে।.........

দুটোর বাসে উঠলাম। বিকেলের অসহ্য রোদের তাপ। রোজকার মত সেলেস্তির রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছি। সবাই খুব ভালো ব্যবহার করেছে। সেলেস্তি আমায় বললে, "পৃথিবীতে মার মত কেউ হয় না।" আসবার সময় সবাই দরজা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিলে। শেষ সময়টা বেশ তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে, কারণ শেষ মুহূর্তে ইমানুয়েল-এর বাড়িতে তার কালো টাই আর কালো ফিতে ধার করবার জন্যে যেতে হয়েছিল। ক-মাস আগেই তার খুড়ো মারা গেছেন।

বাস ধরতে বেশ খানিকটা ছুটতে হল। বোধ হয় ওই রকম তাড়াহুড়ো করায় আর সেই সঙ্গে রোদের হলকা, পেট্রোলের গন্ধ আর রাস্তার ঝাঁকুনির দরুন কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। বেশির ভাগ রাস্তাটা ঘুমিয়েই পার হলাম। জেগে দেখি একজন সৈনিকের গায়ে ভর দিয়ে আছি। সে দাঁত বার করে হেসে জিজ্ঞেস করলে আমি খুব দূর থেকে আসছি কিনা। কথা না বাড়াবার জন্যে শুধু মাথাটা নাড়লাম।

আতুর আশ্রমটা গ্রাম থেকে মাইল খানেকের কিছু বেশি। পায়ে হেঁটেই সেখানে গেলাম। মাকে তক্ষুনি দেখবার অনুমতি চাওয়াতে দরোয়ান জানালে, "ওয়ারডেন-এর সঙ্গে আগে দেখা করতে হবে।" ওয়ারডেন তখন ব্যস্ত, তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। দরোয়ান আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে অফিসে নিয়ে গেল। ওয়ারডেন দেখলাম ছোট্টখাটো মানুষটি, মাথায় পাকা চুল, কোটের বোতামের ঘরে "লিজন্ অফ্ অনার"-এর সম্মানচিহ্ন লাগানো। ফিকে নীল চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল। তারপর আমরা করমর্দন করলাম। আমার হাতটা সে আর ছাড়তেই চায় না। তাই বেশ একটু

অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। এবার টেবিলের একটা রেজিস্টারের পাতা উলটে সে বললে, "মাদাম মুরসো তিন বছর আগে এ আশ্রমে ভর্তি হন। তাঁর নিজের কেউ আর ছিল না, সম্পূর্ণ আপনার ওপরই নির্ভর ছিল।"

মনে হল যেন কোনো-কিছুর জন্যে ওয়ার্ডেন আমাকে দোষী করতে চাইছে। আমি বোঝাবার চেষ্টা করতেই সে বাধা দিয়ে বললে, "না না, আপনাকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি সব কাগজপত্র দেখেছি। ভালোভাবে তাঁর যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করার মত সঙ্গতি আপনার ছিল না। তিনি চাইতেন সারাক্ষণ কেউ না কেউ তাঁর কাছে থাকুক। অথচ যে কাজ আপনি করেন তাতে আপনার মত তরুণদের মাইনে যথেষ্ট নয়। যাই হোক, এ আশ্রমে তিনি সুখেই ছিলেন।"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

তিনি আবার বললেন, "এখানে কয়েকজন ভালো বন্ধুবান্ধব পেয়েছিলেন, জানেন বোধ হয়—তাঁরই মত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। নিজের বয়সী লোকের সঙ্গেই ভালো বনে। আপনি নেহাত ছেলেমানুষ। তাঁর ঠিক সঙ্গী হবার উপযুক্ত নন।"

কথাটা ঠিক। একসঙ্গে যখন থাকতাম মা সারাক্ষণই আমার ওপর নজর রাখতেন। কিন্তু কথাবার্তা আমাদের খুব কম হত। প্রথম আশ্রমে আসবার পর কয়েক হপ্তা তিনি খুব কান্নাকাটি করেছেন। কিন্তু সে শুধু তখনো সুস্থির হয়ে বসতে পারেননি বলে। দু-এক মাস পরে কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যাবার কথাতেই বোধ হয় কাঁদতেন। কারণ সেটাও একরকম বন্ধন ছেঁড়া।

গত বছর আমি তাই খুব বেশি মার কাছে যাইনি। যাওয়া মানে রবিবারটা মাটি হওয়া তো বটেই, তার ওপর বাসে ওঠা, টিকিট করা আর আসতে যেতে দু ঘণ্টা করে সময় নষ্ট।

ওয়ার্ডেন বকে যেতে লাগল। তার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছিলাম না। শেষে সে বললে, "এবার বোধ হয় মাকে দেখতে চান, কেমন?"

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে যেতে যেতে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে বললে, "আশ্রমে শব রাখবার একটা ছোট ঘর আছে। আপনার মার কফিনটা সেখানেই রেখেছি,—অন্য বাসিন্দারা যাতে বিচলিত না হয়। বুঝতেই তো পারছেন! কেউ একজন এখানে মারা গেলে দু-তিনদিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সবাই কেমন একটু অস্থির হয়ে পড়েন। তাতে আমাদের লোকজনেরই শুধু কাজ আর দুর্ভাবনা বাড়ে।"

একটা উঠান পার হয়ে যেতে যেতে দেখলাম কয়েকজন বৃদ্ধ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছেন। আমরা কাছে যেতেই তাঁরা চুপ করে গেলেন। তারপর আমরা এগিয়ে যেতেই পেছনে তাঁদের গুঞ্জন শুরু হল। তাঁদের গলা শুনলে খাঁচার ভেতর একঝাঁক টিয়াপাখির কিচিরমিচির মনে পড়ে যায়। আওয়াজটা অত তীক্ষ্ণ নয় এই যা।

ছোট নীচুগোছের একটা ঘরের দরজার সামনে থেমে ওয়ার্ডেন বললে, "এইখানেই আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে মঁসিয় মারসো। কিছু দরকার হলে আমাকে অফিসেই পাবেন। কাল সকালেই অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। রাতটা তা হলে মায়ের কফিন-এর পাশে কাটাতে পারবেন। আপনারও নিশ্চয় তাই ইচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা; আপনার মার বন্ধুবান্ধবের কাছে জানলাম গির্জার নিয়মকানুন অনুযায়ী তাঁকে কবর দেওয়া হোক এই তিনি চেয়েছিলেন। সেইরকম ব্যবস্থাই আমি করেছি। তবু কথাটা আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে হল।"



ওয়ার্ডেনকে ধন্যবাদ দিলাম। যতদূর জানি স্পষ্ট নাস্তিক না হলেও মা জীবনে ধর্ম-টর্মর কোনো ধার ধারতেন না।

শব রাখবার ঘরে ঢুকলাম। ঝকঝকে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ঘর। দেয়ালগুলো চুনকাম-করা ধবধবে। ওপরে প্রকাণ্ড একটা স্কাইলাইট। আসবাবপত্রের মধ্যে ক-টা চেয়ার আর বেঁণ্ড। ঘরের মাঝখানে দুটো বেঁণ্ডির ওপর কফিনটা রাখা। ঢাকনিটা ওপরে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্ক্রুগুলো সম্পূর্ণ আঁটা হয়নি, তাদের চকচকে মাথাগুলো গাঢ় বাদামী কফিন-এর কাঠের ওপরে উঁচু হয়ে আছে। একটি আরব মেয়ে—নার্সই হবে বোধ হয়—কফিন-এর পাশে বসে আছে। নীল রঙের আবা (আলখাল্লা) তার গায়ে, মাথার চুলের ওপর বেশ একটু উগ্র রঙের একটা রুমাল বাঁধা।

ঘরটা যার জিম্মায় সেই দরোয়ান এখন এসে পৌঁছল। যেরকম হাঁপাচ্ছে তাতে মনে হয় দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছে।

বললে, "ঢাকনিটা আমরা চাপা দিয়েছি, কিন্তু আপনি এলেই আমার ওপর খুলে দেওয়ার হুকুম আছে, আপনি যাতে মাকে দেখতে পান।"

লোকটা কফিনের দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে জানালাম তার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

"আজ্ঞে? কী বললেন?" সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "আপনি চান না যে আমি...?"

বললাম, "না।"

স্ক্রু-ড্রাইভারটা পকেটে পুরে রেখে সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তখুনি বুঝতে পারলাম 'না' বলাটা আমার উচিত হয়নি। বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করলাম। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, "না কেন বলুন তো?" তার কণ্ঠস্বরে কোনো ভর্ৎসনা নেই, ব্যাপারটা সে শুধু জানতে চায়।

"কেন তা ঠিক বলতে পারব না।" জবাব দিলাম।

খানিকক্ষণ সে তার পাকা গোঁফের ডগাগুলোতে একটু পাক দিলে, তারপর আমার দিকে না চেয়েই মৃদুস্বরে বললে, "বুঝেছি।"

লোকটির চেহারায় একটা প্রসন্নতা আছে। নীল চোখ, লালচে গাল। আমার জন্যে কফিনের কাছে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে আমার পেছনেই বসল। নার্স-মেয়েটি এবার উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় লোকটি চুপিচুপি আমার কানে কানে বললে, "বেচারার একটা আবু আছে।"

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম মাথার চারিধারে ঠিক চোখের নীচে একটা সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তার নাকটা সেই ব্যাণ্ডেজেই ঢাকা পড়েছে। এই সাদা ব্যাণ্ডেজটুকু ছাড়া তার মুখের আর কিছু প্রায় দেখাই যায় না।

মেয়েটি চলে যেতেই লোকটি দাঁড়িয়ে উঠল।

"এবার আপনাকে একলা থাকতে দিয়ে যাচ্ছি।"

ভাবভঙ্গীতে কিছু প্রকাশ করে ফেলেছিলাম কিনা জানি না, কিন্তু চলে না গিয়ে লোকটা আমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে কেউ অমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন যেন বিশ্রী লাগে। আমারও লাগছিল। বেলা বেশ পড়ে আসছে, সমস্ত ঘরময় একটা মধুর কোমল আলো ছড়ানো। মাথার ওপর স্কাইলাইটের গায়ে দুটো বোলতা ভনভন করছে। চোখ এমন ঘুমে ঢুলে আসছিল যে খুলে রাখতেই পারছিলাম না। মুখ না

ফিরিয়েই কতদিন সে এখানে আছে জিজ্ঞেস করলাম।

"পাঁচ বছর।"

উত্তরটা এমন চটপট এল যে মনে হল আমি যে এই প্রশ্ন করব সে জানত।

লোকটির মুখ কিন্তু এইতেই খুলে গেল। খুশি মনেই নিজের গল্প জুড়ে দিলে।

মারেঙ্গোর এক আতুর আশ্রমের দরোয়ানি করে তার শেষজীবনটা কাটবে দশ বছর আগে কেউ বললে সে বিশ্বাসই করত না। বয়েস তার চৌষট্টি সে জানালে। সে পারীর লোক।

একথা শুনে বললাম, "ও, এখানে তা হলে তোমার বাড়ি নয়?"

মনে পড়ল ওয়ার্ডেন-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাবার আগে মার সম্বন্ধে সে কি যেন সব বলেছিল। বলেছিল, এ অঞ্চলের, বিশেষ করে এই সমতলের গরমের দরুন মার কবর খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার। পারীতে তিন দিন এমনকি চার দিন পর্যন্ত শব রেখে দেওয়া যায়। জীবনের বেশির ভাগই সে যে পারীতে কাটিয়েছে আর সেখানকার কথা যে সে ভুলতে পারে না সেকথা পরে জানিয়েছিল। বলেছিল, "এখানে সবই যেন কেমন তাড়া-হুড়ো করে সারতে হয়। কারুর মারা যাওয়ার ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না বুঝতেই শেষ কাজ সারতে ডাক পড়ে যায়।"

"খুব হয়েছে।" তার স্ত্রী বাধা দিয়ে বলেছিল, "ভদ্রলোক ছেলেমানুষ। ও বেচারার কাছে এসব কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।"

দরোয়ান অপ্রস্তুত হয়ে আমার কাছে মাপ চাইবার চেষ্টা করায় বলেছিলাম, "ঠিক আছে।" সত্যি কথা বলতে কি সে যা বলছিল তা শুনতে আমার আগ্রহই একটু হচ্ছিল। এসব কথা আমি আগে ভাবিনি।

এখন লোকটা বলতে আরম্ভ করলে যে আতুর আশ্রমের একজন বাসিন্দা হয়েই সে এখানে ঢুকেছিল। কিন্তু এখনো সে সুস্থ সবল। তাই দরোয়ানের কাজটা খালি হতেই সে সেটা নিজে থেকে নিয়েছে।

আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম যে এ কাজটা নিলেও সে আর সকলের মতই আশ্রমের একজন বাসিন্দা মাত্র। কিন্তু সে তা মানতে রাজী হল না। সে নাকি অফিসার গোছের লোক। এর আগে লক্ষ্য করেছি যে আশ্রমের তার বয়সী বাসিন্দাদেরও সে 'ওরা', কি মাঝে মাঝে 'বুড়োবুড়ি' এইভাবে উল্লেখ করে। তবু তার কথাটা আমি বুঝলাম। দরোয়ান হিসেবে তার একটু মর্যাদা আছে, আর সবাইয়ের ওপর একটু কর্তৃত্বও খাটে।

নার্স-মেয়েটি সেই মুহূর্তে ফিরে এল। দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে। স্কাই-লাইটের ওপরের আকাশ যেন হঠাৎ কালো হয়ে এল। দরোয়ান সুইচ টিপে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলে। আচমকা সেই উজ্জ্বলতায় চোখ যেন আমার ধাঁধিয়ে গেল।

দরোয়ান খাবার-ঘরে গিয়ে রাতের খাবারটা সেরে আসতে বলল। কিন্তু খিদে আমার তখন পায়নি। সে আমার জন্যে এক বাটি গরম দুধ-দেওয়া কফি আনতে চাইলে। এই জিনিসটা আমার খুব প্রিয়। তাই ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালাম। কয়েক মিনিট বাদে ট্রে-তে করে সে কফি নিয়ে এল। কফিটা খেয়ে ফেলবার পর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে কাজটা সঙ্গত হবে কিনা বুঝতে পারলাম না। খানিক ভাবলাম। তারপর মনে হল এতে এমন কিছু আসে-যায় না। দরোয়ানকেও একটা সিগারেট দিয়ে দুজনে সিগারেট খেতে শুরু করলাম। খানিক বাদে সে আবার আলাপ



শুরু করলে।

"জানেন, আপনার মার বন্ধুবান্ধবেরা শিগগিরই আপনার সঙ্গে কফিন পাহারা দিয়ে রাত জাগবার জন্যে এখানে আসবেন। কেউ মারা গেলে এখানে এরকম 'রাত-পাহারা' দেওয়া নিয়ম। আমি বরং গোটাকতক চেয়ার আর এক পট কালো কফি নিয়ে আসি।"

সাদা দেয়ালগুলো থেকে ঠিকরোনো কড়া আলোটা বড্ড চোখে লাগছিল। একটা আলো নিবিয়ে দিতে পারবে কিনা দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

"তা সম্ভব নয়," সে বললে। আলোগুলোর নাকি এমন ব্যবস্থা যে সবগুলো হয় একসঙ্গে জ্বলবে বা নিববে। এর পর তার সঙ্গে আলাপ করবার আর বিশেষ উৎসাহ রইল না। বেরিয়ে গিয়ে সে কয়েকটা চেয়ার এনে কফিনের চারপাশে সাজিয়ে রাখল। গোটা বারো কাপ আর একটা কফির পট রাখল তারই মধ্যে একটা চেয়ারের ওপর। তারপর কফিনের অন্যদিকে আমার দিকে মুখ করে সে বসল। নার্স-মেয়েটি ঘরের অন্য প্রান্তে আমার দিকে পিছু ফিরে বসে আছে। কি সে করছে দেখা যায় না, তবে পেছন থেকে তার হাত নাড়ার ধরন দেখে মনে হয় সে কিছু বুনছে।

আমার বেশ আরাম লাগছিল। কফিতে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বোধ হয় খানিকক্ষণ ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

কি-রকম একটা খসখসানি শব্দে জেগে উঠলাম। চোখের পাতা এতক্ষণ বন্ধ ছিল বলেই বোধ হয় মনে হল যে আলোটা যেন আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোনোখানে এতটুকু ছায়ার বাষ্প নেই। প্রত্যেকটি জিনিসের সমস্ত কোণ, সমস্ত বাঁক যেন চোখের ওপর দাগ কেটে যাচ্ছে। মায়ের বন্ধু সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভেতরে ঢুকছে। গুনে দেখলাম দশজন। সেই উগ্র সাদা আলোর ঝলকানির মধ্যে তারা যেন প্রায় নিঃশব্দে ভেসে এল। বসবার সময় একটা চেয়ারের একটু আওয়াজ পর্যন্ত হল না। যেভাবে এদের দেখলাম তেমন স্পষ্ট করে জীবনে আর কাউকে বোধ হয় দেখিনি। তাদের চেহারার, পোশাকের কোনো খুঁটিনাটি আমার চোখ এড়াল না। তবু কানে তাদের কোনো আওয়াজই পেলাম না। তারা সত্যিই জীবন্ত কিনা বিশ্বাস করা শক্ত।

বৃদ্ধাদের প্রায় সকলেরই গায়ে একটা করে অ্যাপ্রন। অ্যাপ্রনের দড়িগুলো কোমরে আঁট করে বাঁধায় প্রকাণ্ড তলপেটগুলো যেন আরও ঠেলে বেরিয়েছে। বুড়িদের যে এতবড় ভুঁড়ি হয় তা আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। পুরুষদের প্রায় সবাই ক্ষয়রোগীর মত রোগা। তাদের সবাইকারই হাতে লাঠি। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল এই যে তাদের মুখের দিকে চাইলে চোখ দেখা যায় না। কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়ার জটের মধ্যে শুধু যেন একটা মিটমিটে নিভু-নিভু আঁচের আভাস।

বসবার পর তারা সবাই আমার দিকে তাকাল। ফোকলা মুখের মধ্যে ঠোঁটগুলো যেন ঢুকে গেছে। মাথাগুলো নড়ছে কেমন বেয়াড়া বিশ্রীভাবে। ঠিক বুঝতে পারলাম না এসব বার্ধক্যেরই কোনো লক্ষণ না তারা আমায় কিছু বলতে চাইছে। মনে হল তাদের নিজেদের ধরনে তারা আমায় আপ্যায়ন করতে চাইছে। কিন্তু দরোয়ানের চারিদিকে ঘিরে বসে বুড়োবুড়িরা মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে আমায় গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করছে—কি-রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাতে আমার হচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্যে একটা আজগুবি ধারণাও আমার হল,—এরা সবাই যেন আমার বিচার করতে এসেছে।

কয়েক মিনিট বাদে বৃদ্ধাদের একজন ফোঁপাতে শুরু করলেন। বৃদ্ধা দ্বিতীয় সারিতে বসেছে। সামনে আর-একটি বৃদ্ধা থাকার দরুন তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু নিয়মিতভাবে থেকে থেকে তার চাপা ফোঁপানি শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে বুঝি আর থামবেই না। অন্যদের কিন্তু তাতে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। নিঃশব্দে চেয়ার-গুলোর ওপর থুবড়ে বসে তারা হয় কফিনটা নয় তাদের হাতের লাঠি বা সামনের যে-কোনো জিনিসের ওপর একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেই বৃদ্ধা ফুঁপিয়েই চলেছে। একটু অবাকই লাগছিল কারণ তাকে আমি চিনি না। ভাবছিলাম কান্না থামাতে বলি, কিন্তু কথা বলতে সাহস হল না। কিছুক্ষণ বাদে দরোয়ান তার কানের কাছে নীচু হয়ে চুপিচুপি কি যেন বলল। তাতে শুধু মাথা নেড়ে জড়ানো গলায় কি যে সে গুজগুজ করে বলল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কান্না তার সমানেই চলতে লাগল।

দরোয়ান এবার উঠে পড়ে তার চেয়ারটা আমার কাছে সরিয়ে নিয়ে এসে বসল। খানিক চুপ করে থেকে আমার দিকে না চেয়েই সে বোঝাতে চেষ্টা করলে, "ও আপনার মার খুব অনুগত ছিল। বলছে যে আপনার মা-ই পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু ছিলেন। এখন তাই ও একেবারে একা।"

এর জবাবে কিছুই বলতে পারলাম না। অনেকক্ষণ ধরে ঘরটা নিস্তব্ধ। বৃদ্ধার ফোঁপানি ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমে থেমে এল। আর কয়েক মিনিট একটু-আধটু ফুঁপিয়ে সেও শেষে চুপ করে গেল।

ঘুমের ঘোর আমার কেটে গেছে। কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পাগুলো বড় টনটন করছিল। এইবার বুঝতে পারলাম যে এদের নিস্তব্ধতাও আমার অসহ্য হয়ে উঠছে। শুধু একটা অদ্ভুত শব্দই মাঝে মাঝে পাচ্ছিলাম। বুঝতে না পেরে প্রথমটা বেশ গোলমালই লাগছিল। ভালো করে কান পেতে শুনে ব্যাপারটা কি তার পরে বুঝতে পারলাম। বুড়োরা তাদের কুঁকড়ে-যাওয়া গালগুলোর ভেতরটা চুষছে। বিদঘুটে হুম্-হুম্ শব্দটা তার থেকেই হচ্ছে। নিজেদের ভাবনায় এমন তারা মগ্ন যে আর কিছুর হুঁশই তাদের নেই। এমন কি কফিনের ভেতরকার মৃতদেহটির সম্বন্ধেও তাদের মন অসাড় বলে আমার একবার মনে হয়েছিল। সেটা আমার ভুল বলেই এখন অবশ্য সন্দেহ হয়। দরোয়ান কফি ঢেলে দিতে সবাই আমরা তাই পান করলাম। তারপর বিশেষ কিছু আর আমার মনে নেই। কোনোরকমে রাত কেটে গেল। শুধু একটা মুহূর্ত স্মরণ করতে পারি। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি একজন বাদে আর সব বুড়োবুড়ি চেয়ারের ওপর বসে বসেই ঘুমোচ্ছে। দু হাতে লাঠিটা ধরে তার ওপর চিবুকের ভর দিয়ে সেই বুড়ো আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। যেন সে আমার জেগে ওঠার অপেক্ষাই করছিল। তখনই অবশ্য আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদেই পায়ের যন্ত্রণায় আবার জেগে উঠতে হল। পা-টা ঝিঁঝিঁ ধরে কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে।

স্কাইলাইটের ওপর ভোরের একটু আভাস দেখা যাচ্ছে। মিনিট দুয়েক বাদে একজন বুড়ো জেগে উঠে খকখক করে কাশতে লাগল। কেশে সে তার বড় নকশা-কাটা রুমালটায় থুথু ফেলছিল। প্রত্যেক বার থুথু ফেলার সময় মনে হচ্ছিল সে যেন বমিই করছে। অন্য সবাই এ আওয়াজে জেগে উঠল। দরোয়ান জানালে যে এবার তাদের যাবার সময় হয়েছে। সবাই তা শুনে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ রাত অস্বস্তির মধ্যে পাহারায় কাটিয়ে তাদের মুখগুলো সব ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। একটা ব্যাপারে বড় আশ্চর্য লাগল।



সবাই তারা আমার সঙ্গে করমর্দন করলে। সারা রাত পরস্পরের সঙ্গে একটা কথাও আমরা বলিনি। কিন্তু একসঙ্গে রাত কাটানোর দরুনই বুঝি একটা অন্তরঙ্গতা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

আমি তখন একেবারে শেষ হয়ে গেছি। দরোয়ান আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। একটুখানি পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম। সে আমাকে কিছু দুধ-দেওয়া কফি দিল। তাতে একটু যেন উপকার হল। বাইরে যখন বেরুলাম তখন রোদ উঠে গেছে। মারেঙ্গো আর সমুদ্রের মাঝখানের পাহাড়গুলোর ওপরকার আকাশে লালচে মেঘের ছোপ। সকালের সমুদ্রের হাওয়া বইছে, তাতে বেশ একটা মধুর নোনা স্বাদ। দিনটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে। কতকাল শহরের বাইরে কোথাও যাইনি। মার এই ব্যাপারটা না ঘটলে সকালের এই বেড়ানোটা কি সুন্দরই লাগত—নিজের অজান্তে এরকম ভাবছি দেখে নিজেই চমকে উঠলাম।

বাইরে উঠোনে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডা মাটির গন্ধ নাকে আসছে। ঘুমের ঘোরটা দেখলাম একদম কেটে গেছে। অফিসের অন্য লোকজনের কথা মনে পড়ল। এখন তারা ঘুম থেকে উঠে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে। মিনিট দশেক এইরকম অনেক কিছু ভাবলাম। তারপর বাড়িটার ভেতর থেকে একটা ঘণ্টার শব্দ কানে এল। জানালার ওধারে লোকজনের নড়াচড়া দেখতে পেলাম। তারপর আবার সব শান্ত। সূর্য আর-একটু ওপরে উঠেছে, রোদে পা-টা গরম হতে শুরু করেছে। দরোয়ান উঠোন পার হয়ে এসে আমাকে জানালে যে আশ্রমের ওয়ার্ডেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ওয়ার্ডেনের অফিসে যাওয়ার পর তিনি আমাকে দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করিয়ে নিলেন। তিনিও শোকের কালো পোশাক পরেছেন লক্ষ্য করলাম।

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কবর দেওয়ার লোকেরা এসে গেছে। তারা এইবার গিয়ে কফিনের ডালা এঁটে দেবে। আপনি কি মাকে একবার শেষ দেখা দেখতে চান? তাহলে তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলি।"

বললাম, "না, তার দরকার নেই।"

তিনি নীচু গলায় ফোনে বললেন, "ঠিক আছে ফিজিয়াক। ওদের কফিন আঁটতে যেতে বল।"

কবর দেওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন জানালেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। এবার ডেস্কের ওধারে পায়ের ওপর পা রেখে তিনি পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন যে মৃতদেহ যে পাহারা দিচ্ছে সে ছাড়া তিনি আর আমি শুধু শবযাত্রায় যাব। এ আশ্রমের একটা নিয়ম এই যে বাসিন্দারা কবর দেওয়ার সব অনুষ্ঠানে যেতে পারে না। যদিও আগের রাত্রে কফিন পাহারা দিয়ে রাত জাগতে তাদের মানা নেই।

"ওদের খাতিরেই এরকম নিয়ম করা", তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, "ওদের যাতে মনে আঘাত না লাগে। তবে আজকের ব্যাপারে আপনার মার এক পুরানো বন্ধুকে আমি সঙ্গে যাবার অনুমতি দিয়েছি। তার নাম টমাস পেরেজ।"

ওয়ার্ডেন একটু হেসে আবার বললেন, "এক হিসেবে ব্যাপারটা করুণ গল্পের মত। পেরেজ ও আপনার মা প্রায় হরিহর-আত্মা হয়ে উঠেছিলেন। অন্য সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পেরেজকে এই নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে জ্বালাতন করত। বলত, 'কবে বিয়ে করছ হে'?

পেরেজ হেসে উড়িয়ে দিত। এটা একটা ওদের মধ্যে চলতি হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনার মার মৃত্যুতে পেরেজ অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে। তাকে শবযাত্রায় যেতে বারণ করতে তাই আর মন সরল না। আমাদের ডাক্তারের পরামর্শে তাকে কিন্তু আগের রাত্রে কফিনের পাশে জাগতে অনুমতি দিইনি।"

কিছুক্ষণ তারপর নীরবে দুজনে বসে রইলাম। ওয়ার্ডেন একবার উঠে জানালার ধারে গেলেন। খানিক বাদে বললেন, "মারেঙ্গো থেকে ওই তো পাদ্রীসাহেব এসে গেছেন। উনি একটু আগেই এসেছেন দেখছি।"

গির্জাটা পাশের গ্রামে। সেখানে যেতে প্রায় পৌনে একঘণ্টা লাগবে একথাও ওয়ার্ডেন আমাকে জানিয়ে দিলেন। আমরা এবার নীচে নেমে গেলাম।

কফিন যেখানে রাখা হয়েছে সে ঘরের বাইরেই পাদ্রী অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন শিষ্য। তাদের একজনের কাছে একটা ধুনুচি। ধুনুচিটা একটা রুপোর চেন দিয়ে ঝোলানো। পাদ্রী তার ওপর ঝুঁকে পড়ে চেনটা কতখানি লম্বা রাখা হবে তাই ঠিক করছিলেন। আমাদের দেখে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে সস্নেহে দু-একটি কথা বলে আমাদের নিয়ে কফিনের ঘরের দিকে এগোলেন।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম চারজন কালো পোশাক-পরা লোক কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কফিনের ডালা আঁটা হয়ে গেছে। সে মুহূর্তেই ওয়ার্ডেন জানালেন যে কফিন বইবার গাড়ি এসে গেছে। পাদ্রীও তাঁর প্রার্থনা শুরু করলেন। এইবার আমরা সবাই যাবার জন্যে এগোলাম। এক টুকরো কালো কাপড় নিয়ে বাহক চারজন কফিনের দিকে গেল। বাকি আমরা সবাই বাইরে বেরুলাম। দরজার কাছে একজন অচেনা মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"ইনি মাসিঁয় মারসো," বলে ওয়ার্ডেন তাকে আমার পরিচয় দিলেন মহিলার নামটা ঠিক শুনতে পেলাম না, শুধু বুঝলাম তিনি আশ্রমের একজন নার্স। পরিচয়ের সময় তিনি মাথা নোয়ালেন কিন্তু লম্বাটে হাড়বেরুনো মুখে এতটুকু প্রসন্নতার আভাস দেখা গেল না।

পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমরা কফিনটা যাবার পথ করে দিলাম। তারপর বাহকদের পিছু-পিছু সামনে দরজা পর্যন্ত গেলাম। কফিন বইবার গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আগাগোড়া কালো চকচকে জিনিসটা দেখলে অফিসের কলম রাখবার জায়গাটার কথা মনে পড়ে।

কফিনের গাড়ির পাশে অদ্ভুত পোশাকপরা ছোটখাট একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। শেষকৃত্যের তদারক করাই তার কাজ বুঝলাম। এসব অনুষ্ঠানের একরকম পরিচালক বলা যায়। তার কাছেই মার বিশেষ বন্ধু মাসিঁয় পেরেজকে দেখলাম। বৃদ্ধকে কেমন সংকুচিত, প্রায় লজ্জিত মনে হচ্ছিল। মাথায় অত্যন্ত চওড়া কানা দেওয়া সেকেলে নরম ফেল্টের হ্যাট, একটু বেশিরকম ঝোলা প্যাণ্ট পরনে, উঁচু কলারের তুলনায় কালো টাইটা অত্যন্ত বেমানানভাবে ছোট। দরজা থেকে কফিন বার করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন। লক্ষ্য করলাম রগুতে ভরতি মোটা নাকটার তলায় তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। তাঁর কান দুটোই আমার সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল। বড় বড় ঝোলা লালচে কান দুটিকে তাঁর ফ্যাকাশে গালের পাশে যেন শীলমোহরের গালার মত লাগছে। কানের রেশমী সাদা চুলগুলিও চোখে পড়ল।



কফিনের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমরা যে যার জায়গায় দাঁড়ালাম। গাড়ির সামনে পাদ্রী, কালো পোশাক-পরা চারজন বাহক তার দুই পাশে, তাদের পেছনে আমি ও ওয়ার্ডেন আর সবশেষে বৃদ্ধ পেরেজ ও সেই নার্স।

ইতিমধ্যেই রোদ চড়া হয়ে উঠেছে, বাতাসও গরম হয়ে গেছে। পিঠে বেশ রোদের তাত লাগছে অনুভব করলাম। কালো পোশাকটার দরুন কষ্টটা আরও বেশি হচ্ছিল। রওয়ানা হবার জন্যে কেন যে আমাদের এত দেরি হল আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। পেরেজ টুপিটা আবার মাথায় দিয়েছিলেন, সেটা খুলে ফেললেন। আমি তাঁর দিকে সামান্য একটু ফিরেছিলাম। ওয়ার্ডেন ঠিক সেই সময়ই পেরেজের কথা আমায় বলতে শুরু করলেন। বিকেলের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়লে আমার মা ও পেরেজ নাকি প্রায়ই অনেকদূর একসঙ্গে বেড়িয়ে আসতেন। কখনো কখনো দূরের গ্রাম পর্যন্তও যেতেন। নার্স অবশ্য সঙ্গে থাকত।

জায়গাটা দেখছিলাম। আকাশের দিকে লম্বা সাইপ্রাস্ গাছের সব সারি উঠে গেছে। দূরের পাহাড় আর উজ্জ্বল সবুজের ছোপ-লাগানো তপ্ত লাল মাটি দেখা যাচ্ছে, আর তারই মাঝে এখানে-সেখানে একটা-দুটো নির্জন বাড়ি পেছনের উজ্জ্বল আকাশের আলোয় আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে। মার মনের অবস্থাটা খানিকটা আমি বুঝতে পারলাম। এসব অঞ্চলে সন্ধ্যার সময়টায় একটা যেন করুণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। এখন সকালের সূর্যের প্রখর আলোয় রোদের তাতে সব কিছু যেন কাঁপছে। সমস্ত দৃশ্যটা মনকে দমিয়ে দেয়।

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম পেরেজ একটু খুঁড়িয়ে চলেন। ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। কালো পোশাক-পরা বাহকদেরও একজন পিছিয়ে পড়ে আমার সঙ্গে চলতে লাগল। কত তাড়াতাড়ি সূর্য আকাশে উঠে গেছে দেখে অবাক হলাম। হঠাৎ খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ ধরেই তেতে-ওঠা ঘাসের ওপর পোকাদের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার মুখে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। টুপি আনিনি বলে রুমাল দিয়ে হাওয়া খাবার চেষ্টা করলাম।

যে লোকটি পিছিয়ে পড়েছিল সে আমায় কী যেন বলল পরিষ্কার শুনতে পারলাম না। ডান হাতে টুপিটা একটু উঁচিয়ে সে বাঁ হাতের রুমাল দিয়ে মাথার তালুটা মুছল। কি সে বলছে জিজ্ঞাসা করায় ওপরে আঙুল দেখিয়ে বললে, "রোদটা আজ বড় কড়া, না?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

খানিক বাদে সে জিজ্ঞাসা করলে, "যাঁকে কবর দিতে যাচ্ছি তিনি কি আপনার মা?"

আবার বললাম, "হ্যাঁ।"

"বয়েস কত হয়েছিল?"

"তা বেশ হয়েছিল।" সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেই মায়ের ঠিক বয়েস জানি না।

লোকটা তারপর চুপ করে রইল। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম পেরেজ অনেক দূরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেই এক হাতে ফেল্ট হ্যাটটা ধরে সে দোলাচ্ছে। ওয়ার্ডেনের দিকেও চোখ গেল। অত্যন্ত সাবধানে যেন মাপা-মাপা পা ফেলে তিনি চলছেন। তাঁর কপালেও ঘামের ফোঁটা চিকচিক করছে। কিন্তু মুছে ফেলবার কোনো চেষ্টা তাঁর নেই।

মনে হল আমরা সবাই যেন আগের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছি। যেদিকেই

তাকাই শুধু রোদে-পোড়া প্রান্তর। আকাশ এমন চোখ-ঝলসানো যে আমি চোখই তুলতে সাহস করছিলাম না। এবার নতুন পিচ-ঢালা খানিকটা রাস্তা পেলাম। তার ওপর দিয়ে রোদের হল্‌কা যেন কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে। পা ফেলতে গেলে প্যাচ-প্যাচ করে জুতো বসে যায়। চকচকে কালো ঘায়ের মত দাগ পেছনে পড়ে থাকে।

সামনে গাড়োয়ানের চকচকে কালো টুপিটা যেন ওই চটচটে জিনিস দিয়েই তৈরী মনে হচ্ছিল। মাথার ওপরে আকাশের চোখ-ঝলসানো তাত আর চারিধারে এই সব কালো রঙের বৈচিত্র্যে সবকিছু কেমন অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মত লাগছিল। তার ওপর নানা রকম সব গন্ধ,—তেতে-ওঠা চামড়ার, ঘোড়ার বিষ্ঠার আর তারই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে মেশানো ধূপের ধোঁয়ার। একেই তো আগের রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, তার ওপর এই সব মিলে আমার দৃষ্টি ও মন ঝাপসা করে দিচ্ছিল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি পেরেজ অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছেন। রোদের হলকায় তাঁকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এর পর হঠাৎ তিনি একেবারে অদৃশ্যই হয়ে গেলেন।

প্রথমটা অবাক হয়েই গিয়েছিলাম। তারপরে বুঝলাম রাস্তা ছেড়ে তিনি মাঠের পথ ধরেছেন। রাস্তাটা সামনে খানিক দূরে একটা বাঁক নিয়েছে দেখতে পেলাম। এ অঞ্চল পেরেজের নিশ্চয়ই ভালোরকম চেনা। আমাদের নাগাল ধরবার জন্যে তাই তিনি সহজ রাস্তা ধরেছেন। আমরা বাঁকটা ঘোরবার পরেই তিনি আমাদের সঙ্গ ধরে ফেললেন। কিন্তু তারপর আবার পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। আরও খানিকটা গিয়ে তিনি আবার আর-একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন; এভাবে পথ সংক্ষেপ করবার চেষ্টা এর পরে তাঁকে অনেকবারই করতে দেখলাম। কিন্তু তখন আমার মাথা দপদপ করতে শুরু করেছে। তিনি কোথা দিয়ে যাচ্ছেন আসছেন সে বিষয়ে আর আমার কোনো কৌতূহলই নেই। নিজের পা দুটো টেনে নিয়ে যাওয়াই তখন আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর পর সবকিছু যেন হুড়হুড় করে হয়ে গেল। হল এমন শুষ্ক শৃঙ্খলার সঙ্গে যে তার খুটিনাটি কিছু আমার মনেই নেই। শুধু মনে আছে গ্রামের বাইরে গিয়ে পৌঁছবার পর সেই নার্স আমাকে যা বলেছিল। তার বলার সঙ্গে আমি চমকে উঠেছিলাম। মুখের চেহারার সঙ্গে তার গলার স্বর একেবারে মেলেই না। গলার স্বর বেশ সুরেলা আর একটু কাঁপা-কাঁপা। নার্স বলেছিল, "এখানে আস্তে হাঁটলে সর্দিগর্মির ভয়, আবার বেশি তাড়াতাড়ি হেঁটে ঘামলে গির্জার ভেতরকার হাওয়ায় ঠান্ডা লাগতে পারে।" তার বক্তব্যটা বুঝেছিলাম; কোনোদিকেই নিস্তার নেই।

সেদিনকার আরও কয়েকটা স্মৃতি আমার মনে দাগ কেটে আছে। যেমন, গ্রামের বাইরে পেরেজ শেষবার যখন আমাদের নাগাল ধরে ফেলেন তখন তাঁর মুখের চেহারাটা। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। হয়তো ক্লান্তিতে বা দুঃখে, হয়তো বা দুয়ে মিলেই। কিন্তু মুখের বলিরেখাগুলোর জন্যে চোখের জল বেশিদূর গড়াতে পারছে না। শুকনো কোঁচকানো মুখের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে গিয়ে যেন সমস্ত মুখটার ওপর একটা মসৃণ পালিশ বুলিয়ে দিয়েছে।

গির্জার চেহারাটাও আমার মনে আছে, রাস্তায় গ্রামের লোকগুলোর কথা, কবরগুলোর ওপর সেই লাল ফুলগুলো, পেরেজের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ন্যাকড়ার পুতুলের মত তিনি যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে মার কফিনের ওপর গেরুয়া রঙের মাটি ঝরঝর করে পড়ছে। তার সঙ্গে ছোট ছোট সাদা শেকড়ের টুকরো মেশানো। সেই লোকের ভিড়,



কোলাহল, একটা কাফের বাইরে দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করা, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আর অ্যালজিয়ার্সের প্রথম আলোয় ঝলমল রাস্তায় ঢোকবার পর আমার সেই খুশির শিহরণটুকু—সোজা বিছানায় গিয়ে উঠে একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা ঘুমোবার ছবিটা আমি তখন দেখতে পাচ্ছি।

## দুই

ঘুম ভাঙবার পর বুঝতে পারলাম দুদিন ছুটি চাইবার সময় আমার মনিবের মুখ কেন ব্যাজার হয়ে উঠেছিল। আজ শনিবার। তখন একথাটা আমার মনে ছিল না। বিছানা থেকে ওঠবার পর এখন ব্যাপারটা বুঝলাম। মনিব নিশ্চয়ই তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার দুদিনের ছুটি আসলে চারদিনের হয়ে দাঁড়াবে। এটা তাঁর পছন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু আজ না হয়ে মার যে গতকাল কবর হয়েছে সেটা তো আর আমার দোষ নয়। শনি-রবিবারের ছুটি আমি পেতামই। তবু মনিবের দিকটাও বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

বিছানা থেকে ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য। আগের দিনের সব ঘটনায় বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছি। দাড়ি কামাতে কামাতে সকালটা কিভাবে কাটাব ভাবলাম। স্থির করলাম সাঁতার কাটতে যাওয়াই ভালো। বন্দরে যাবার ট্রামটায় উঠে বসলাম।

সব সেই আগেকার দিনের মত লাগছিল। সাঁতারের জায়গায় অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে। মারী কার্ডোনাকেও তার মধ্যে দেখলাম। আমাদের অফিসে আগে টাইপিস্টের কাজ করত। তখন তার ওপর বেশ একটু দুর্বলতা হয়েছিল। তারও আমাকে ভালো লাগত বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের অফিসে খুব কম দিনই সে ছিল, তাই ব্যাপারটা আর বেশিদূর এগোয়নি।

মারীকে একটা ভেলায় উঠতে সাহায্য করবার সময় হাতটা তার বুকের ওপর যেন নিজের অজান্তে চলে যেতে দিলাম। সে তারপর ভেলার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি তখন পাশে দাঁড়-সাঁতার কাটছি। একটু পরেই সে ফিরে আমার দিকে তাকাল। চুলগুলো চোখের ওপর এসে পড়েছে, মুখে হাসি। আমি ভেলায় উঠে তার পাশে বসলাম। হাওয়ায় বেশ একটা মধুর উষ্ণতা। একটু যেন মজা করেই আমি মাথাটা তার কোলের ওপর রাখলাম। মনে হল তার আপত্তি নেই, সুতরাং সেইভাবেই শুয়ে রইলাম। আমার চোখের ওপর শুধু অনন্ত আকাশ—সোনালী নীল। মাথার নীচে নিশ্বাসের সঙ্গে মারীর দেহের ওঠানামা অনুভব করছিলাম।

ভেলাটার ওপর আধতন্দ্রায় প্রায় আধঘণ্টাটাক কাটালাম। রোদ বেশি চড়া হয়ে ওঠায় সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, আমিও তার পিছু নিলাম। সাঁতরে তাকে ধরে ফেলে তার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে পাশাপাশি এবার সাঁতার কাটতে লাগলাম। ওর মুখে তখনো সেই আগেকার হাসি।

জল থেকে উঠে পাড়ে দাঁড়িয়ে গা মোছবার সময় সে আমায় বললে, "তোমার চেয়ে আমার রঙে রোদের তামাটে ছোপ বেশী।"

আমার সঙ্গে বিকেলে সিনেমাতে যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

সে আবার হেসে বললে, "যাবো। সবাই একটা মজার ছবির কথা বলছে। ওই যেটাতে ফার্নান্ডেল আছে। সেইটাতে যদি নিয়ে যাও তো যাবো।"

আমাদের পোশাক পরা শেষ হবার পর আমার কালো টাইটা ওর নজরে পড়ল। কেউ

মারা গেছেন কিনা সে জিজ্ঞাসা করল।

মার মৃত্যুর কথা তাকে জানালাম।

"কবে?" সে জিজ্ঞাসা করলে।

বললাম, "গতকাল।"

সে আর কিছু বলল না। তবু কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে বুঝতে পারলাম।

ব্যাপারটায় আমার হাত নেই তাকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। মনে পড়ল, মনিবকেও ওই কথাই বলেছি। কথাটা নিজের কানেই কেমন বোকার মত শুনিয়েছিল। বোকার মত হোক বা না হোক নিজেকে একটু অপরাধীও না মনে করে বুঝি পারা যায় না।

যাই হোক, বিকেলে মারীর আর সেসব কথা কিছু মনে নেই দেখলাম। ছবিটা জায়গায় জায়গায় বেশ মজার কিন্তু খুব বাজে জিনিসও যথেষ্ট। ছবি দেখবার সময় সে তার পা-টা দিয়ে আমার পায়ে চাপ দিচ্ছিল, আমিও তার বুকে হাত দিয়ে আদর করছিলাম। ছবিটা শেষ হবার সময় তাকে একবার চুমু খেলাম,—একটু আড়ষ্টভাবেই।

ছবি দেখার পর সে আমার ওখানেই এল।

জেগে উঠে দেখি মারী চলে গেছে। সকালে তার মাসির সামনে হাজির না থাকলেই নয় সে আমায় আগেই জানিয়েছিল।

মনে পড়ল যে দিনটা রবিবার। তাইতে একটু দমে গেলাম। রবিবারটা আমার কোনো কালে ভালো লাগে না। মাথাটা ফিরিয়ে মারীর বালিশ থেকে আলস্যভরে একটু ঘ্রাণ নিলাম। মারীর মাথা থেকে সমুদ্রের নোনা গন্ধ সেখানে লেগে আছে।

দশটা পর্যন্ত ঘুমোলাম। তারপর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে দুপুর পর্যন্ত বিছানাতেই কাটিয়ে দিলাম। সিলেন্তের রেস্তোরাঁয় রোজকার মত আজ আর খাব না ঠিক করলাম। সেখানে গেলেই সবাই নিশ্চয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করে জ্বালিয়ে মারবে। জিজ্ঞাসা-বাদ আমার ভালো লাগে না। তাই কয়েকটা ডিম ভেজে প্যান থেকেই সেগুলো খেলাম। রুটি ছাড়াই খেলাম, কারণ বাড়িতে রুটি ছিল না। নীচে গিয়ে রুটি কিনে আনা বড় ঝামেলা।

খাওয়া-দাওয়ার পর কি করব ভেবে না পেয়ে ছোট ফ্ল্যাটটায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। মা যখন সঙ্গে থাকতেন তখন ফ্ল্যাটটা আমার পক্ষে সুবিধেরই ছিল। এখন আমার একলা থাকার পক্ষে সেটা একটু বেশি বড়। খাবার টেবিলটা তাই শোবার ঘরে এনে রেখেছি। এই ঘরটাই এখন ব্যবহার করি। আসবাব-পত্র যা কিছু দরকার এই ঘরেই আছে,—একটা পেতলের খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল, ক-টা বেতের চেয়ার—বসবার জায়গাগুলো তাদের অল্প-বিস্তর ঝুলে গেছে। এছাড়া ময়লা দাগী আয়না-লাগানো কাপড়চোপড় রাখবার কটা আলমারি। ফ্ল্যাটের বাকি ঘরগুলো কাজে লাগে না। সেগুলো ঝাড়পোছ করবার প্রয়োজনও তাই বোধ করি না।

কিছুক্ষণ বাদে করবার আর কিছু না পেয়ে মেঝেয় ছড়ানো একটা খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। তা থেকে জোলাপের একটা বিজ্ঞাপন কেটে আমার অ্যালবামে সেঁটে রাখলাম। খবরের কাগজে মজার কিছু পেলে আমি ওইভাবে রেখে দিই।



এর পর হাত ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আর কিছুই করবার নেই।

আমার শোবার ঘর থেকে এ অঞ্চলের বড় রাস্তাটা দেখা যায়। বিকেলের আবহাওয়া পরিষ্কার হলেও রাস্তা-বাঁধানো পাথরগুলো কালো ও চকচকে দেখাচ্ছে। সামান্য যে কয়েক-জনকে দেখা যাচ্ছে তাদের সবারই যেন কিসের দারুণ তাড়া। প্রথমেই একটি পরিবারকে দেখা গেল, রবিবারের সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। নাবিকের পোশাক-পরা দুটি ছোট ছেলে—প্যান্টগুলো হাঁটুর কাছেও পৌঁছয়নি—ভালো সাজপোশাকে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। তারপরে একটি ছোট মেয়ে—পায়ে চকচকে কালো চামড়ার জুতো, মাথায় ফিকে সোনালী ফিতে বাঁধা। তাদের পেছনে বাদামী সিল্কের পোশাক-পরা বিপুলকায়া মা চলেছেন, আর তার সঙ্গে ছোট্টখাট্ট ফিটফাট বাপটি। লোকটি আমার চেনা। মাথায় স্ট্র হ্যাট্, হাতে ছড়ি, গলায় প্রজাপতি-টাই। লোকে বলে বড় ঘরের ছেলে হয়ে সে নাঁচু ঘরে বিয়ে করেছে। কথাটা যে সত্যি, স্ত্রীর পাশে তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

এর পর দেখা গেল পাড়ার চালিয়াৎ সব ছোকরাদের,—তেলা পাট-করা চুল, লাল টাই, কোমরের কাছটা অত্যন্ত সরু করে কাটা কোট, তাতে সুচের কাজ-করা পকেট, পায়ে চওড়া-মাথা জুতো। শহরের মাঝখানে বড় কোনো থিয়েটারে যাচ্ছে বুঝলাম। সেইজন্যেই এত আগে বেরিয়ে চড়া গলায় হাসতে হাসতে ও গল্প করতে করতে ট্রাম ধরতে চলেছে।

তারা চলে যাবার পর রাস্তাটা ক্রমশঃ খালি হয়ে গেল। এতক্ষণে সব জায়গার ম্যাটিনী শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। শুধু কয়েকজন দোকানী আর ক-টা বেড়াল ছাড়া রাস্তায় কেউ নেই। রাস্তার ধারের বড় বড় গাছগুলোর ওপরে নির্মেঘ আকাশ দেখা যাচ্ছে, তার আলো কোমল। রাস্তার ওপারের তামাকের দোকানী সামনের ফুটপাতে একটা চেয়ার বার করে এনে তার ওপর আরাম করে বসল। খানিক আগেই ট্রামগুলোয় লোক ধরছিল না সেগুলো এখন প্রায় ফাঁকা। তামাকের দোকানের পাশে "সেজ পিয়ের" নামে ছোট্ট রেস্তোরাঁয় ওয়েটার ফাঁকা ঘরের মেঝের কাঠের গুঁড়ো ঝাঁট দিচ্ছে।

মামুলী মার্কা মারা রবিবারের বিকেল।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমি তামাকের দোকানীর মত ঘোড়ায়-চড়া ধরনে তার ওপর বসলাম। এতে আরাম বেশি। গোটা-দুই সিগারেট খেয়ে ঘর থেকে একটা চকলেট নিয়ে এসে খাবার জন্যে জানলায় এসে বসলাম। খানিক বাদেই আকাশ মেঘলা হয়ে এল। গ্রীষ্মের ঝড় হবে বোধ হয়। মেঘের দল কিন্তু বৃষ্টির একটা হুমকি দিয়েই ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল। রাস্তাটা আর-একটু অন্ধকার হয়েছে। আকাশের দিকে চেয়েই অনেকক্ষণ কাটালাম।

পাঁচটার সময় ট্রামের শব্দ অনেক বেড়ে গেল। শহরের বাইরের দিকে ফুটবল ম্যাচ ছিল সেখান থেকে সবাই ফিরছে। ট্রামগুলো মানুষে ঠাসা। পা-দানীর ওপর পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আর-একটা ট্রামে খেলোয়াড়েরাই ফিরল। তারাই যে খেলোয়াড় তা তাদের প্রত্যেকের হাতে সুটকেস দেখেই বুঝলাম। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দলের গান গাইছিল, "বল যেন না থামে ভাই।" একজন ওপরে তাকিয়ে আমাকে দেখে চীৎকার করে বললে, "দিয়েছি ওদের হারিয়ে।" আমি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললাম, "সাবাস্।" এবার সারে সারে প্রাইভেট গাড়ি দেখা দিতে লাগল।

আকাশের চেহারা আবার বদলেছে। বাড়িগুলোর ওপরে একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ভিড় ক্রমশঃ আরও বাড়তে লাগল। লোকেরা বেড়িয়ে ফিরছে। তাদের মধ্যে সেই ফিটফাট ভদ্রলোক ও তার মোটা স্ত্রীকেও

দেখলাম। ছোট ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়েদের পিছু-পিছু ক্লান্তভাবে নাকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। কয়েক মিনিট বাদে এখানকার ছবিঘরগুলো থেকে কাতারে কাতারে লোক বেরিয়ে এলো। ছবি শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলাম ছোকরারা যেন একটু বেশী বড় বড় পা ফেলে খুব জোরে জোরে হাত-পা নাড়তে নাড়তে চলেছে। ছবিটা নিশ্চয়ই বাহাদুরের খেল গোছের ছিল। শহরের মাঝখানের ছবিঘরে যারা গিয়েছিল তারা ফিরল আর খানিকটা বাদে। তারা আর একটু ধীর স্থির। যদিও কেউ কেউ তাদের এখনো হাসছিল। সব সুদ্ধ জড়িয়ে কিন্তু তাদেরও কেমন ক্লান্ত আলস্য জড়িত ভাব। তাদের কয়েকজন আমার জানলার নীচের রাস্তায় আড্ডা দেবার জন্য থেকে গেল। হাতে হাত ধরে একদল মেয়ে আসছে। জানলার নীচে যারা দাঁড়িয়েছিল, সেই ছোকরারা তাদের গায়ে গা লাগাবার জন্যে একটু ঘুরে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে কি সব ঠাট্টাও করল। মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ওরা আমাদের পাড়ারই বলে চিনলাম, তাদের মধ্যে দু-তিনজন আমায় দেখে হাত নাড়লো।

রাস্তার আলোগুলো এইবার জ্বলে উঠল এক সঙ্গে। আকাশে যে তারাগুলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল সেগুলো আরো মিটমিটে হয়ে গেল। রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ-দুটো আমার ক্লান্ত হয়ে এসেছে। বাতিগুলোর নীচে নীচে যেন খানিকটা করে তরল উজ্জ্বলতা জমে আছে। মাঝেমাঝে চলতি ট্রামগুলোর আলোয় কোনো একটি মেয়ের চুল, কি হাসি, কি রুপোর বালা ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

এর কিছুক্ষণ বাদে ট্রাম চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এল। রাস্তার ধারের বাতি আর গাছ-গুলোর ওপরে আকাশটা কালো মখমলের মত দেখাচ্ছে। একটু একটু করে রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। একটি মানুষকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা বেড়াল কোনোরকম ব্যস্ত না হয়ে ধীরে ধীরে নির্জন রাস্তাটা পার হয়ে গেল।

রাত্রের খাবার ব্যবস্থাটা এবার তো করতে হয়। নীচের রাস্তা দেখবার জন্যে চেয়ারে বসে এতক্ষণ মাথা নুইয়ে রাখার দরুন উঠে দাঁড়াবার সময় ঘাড়টা কেমন টনটন করতে লাগল। নীচে গিয়ে কিছু রুটি আর স্পাগেটি কিনে নিয়ে এসে নিজেই রেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলাম। জানলায় দাঁড়িয়ে আর একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তাই সে চেষ্টা আর করলাম না। জানলা বন্ধ করে ফিরে আসতে আসতে আয়নাটার দিকে একবার চোখ পড়ল। আমার স্পিরিট-ল্যাম্প আর তার পাশে রুটির কয়েকটা টুকরো সমেত টেবিলটার একটা কোণ সেখানে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল যেমন করে হোক আর একটা রবিবার কাটিয়ে দিয়েছি। মনে হল মার কবর হয়ে গেছে আর কালই আবার রোজকার মতো চাকরি করতে যেতে হবে। সত্যি, জীবনের কিছুই আমার বদলায়নি।

## তিন

অফিসে সকালে খুব কাজের চাপ ছিল। মনিবের মেজাজ আজ ভালো। আমার খুব ক্লান্ত লাগছে কিনা তাও একবার খোঁজ নিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—মার বয়স কত হয়েছিল। একটু ভেবে নিয়ে বললাম—"প্রায় ষাট হবে।" ভাবতে হল পাছে ভুল করি সেই ভয়ে।

আমার জবাব শুনে মনিবের কেন জানি না একটু যেন দুশ্চিন্তা গেল মনে হল। আলাপটা ওই কথাতেই যেন শেষ।



টেবিলে এক গাদা বিল জমে আছে। সেগুলো সবই দেখতে হল। দুপুরের খাবারের জন্যে বাইরে যাবার আগে হাত ধুয়ে নিলাম। দুপুরে এই হাত ধোয়া সেরে নিতে আমার ভালো লাগে। বিকেলে অনেকে ব্যবহার করার দরুন লাটিম জড়ানো তোয়ালেটা ভিজে সপসপে হয়ে থাকে—তখন কেমন ছুঁতে খারাপ লাগে।

একবার মনিবকে কথাটা জানিয়েছিলাম। অসুবিধে যে হয় তা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার বই তো নয়।

অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরিতে—সাড়ে বারোটা নাগাদ অফিস থেকে ইমানুয়েলের সঙ্গে বার হলাম। ইমানুয়েল আমাদেরই অফিসে 'ফরোয়ার্ডিং' বিভাগে কাজ করে।

সমুদ্রের ধারেই আমাদের অফিস। বাইরের রাস্তায় নামবার সিঁড়িতে একটু দাঁড়িয়ে বন্দরের জাহাজগুলোর দিকে একবার তাকালাম। চড়া চোখ-ঝলসানো রোদ। ঠিক সেই সময়ে ইঞ্জিনের ফটফট আর চেন-এর ঝনঝন শব্দের রোল তুলে একটা বড় লরি চলে গেল। ইমানুয়েল লরিটায় লাফিয়ে ওঠার কথা বললে। দৌড়তে শুরু করলাম। লরিটা তখন অনেক এগিয়ে গেছে। বেশ খানিকটা তার পেছনে আমাদের ছুটতে হল। একে ওই গরম, তার ওপর লরিটার বিদঘুটে আওয়াজে মনে হল যেন মাথা ঝিমঝিম করছে। বন্দরের ধার দিয়ে পাগলের মতো ছুটছি—এইটুকুই শুধু তখন খেয়াল আছে—বড় বড় ক্রেন আর জাহাজের জটলা অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে—দূরে মাস্তুলগুলো নড়ছে।

আমিই প্রথম লরিটা ধরে ফেলে এক লাফে উঠে বসলাম, তারপর ইমানুয়েলকে ধরে ওঠালাম। দুজনেই তখন হাঁপাচ্ছি। এবড়ো খেবড়ো নুড়ি-ফেলা রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে লরিটার ঝাঁকানিতে অবশ্য আরো কাহিল। ইমানুয়েল খুশিতে হেসে উঠে আমার কানে কানে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—"ধরেছি ঠিক।"

'সিলেস্তে'র রেস্তোরাঁয় যখন গিয়ে পৌঁছালাম তখন ঘেমে নেয়ে গেছি। দরজার কাছেই সিলেস্তে তার নিজের মার্কা-মারা জায়গাটিতে বসে আছে। ভুঁড়ির ওপর জামাটা ঠেলে উঠে আছে। শাদা গোঁফ জোড়া পাকানো।

আমায় দেখে একটু সমবেদনা জানাল—"আশা করি খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়নি?"

বললাম—"না।"

দারুন ক্ষিদে পেয়েছে তখন। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া সারলাম। শেষ কালে এক কাপ কফি নিলাম। খাওয়া শেষ করে আমার নিজের জায়গাটিতে গিয়ে শুলাম একটু কাক-তন্দ্রার জন্যে। মদটা একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

জেগে উঠে বিছানা ছাড়বার আগে একটা সিগারেট খেলাম। দেরি হয়ে গেছল একটু তাই ট্রাম ধরবার জন্যে দৌড়তে হল।

অফিসে অসহ্য দমবন্ধ করা গরম। সারা বিকেলটা কাজেরও একটু ফাঁক পেলাম না। অফিস বন্ধ হবার পর জেটিগুলোর ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডায় একটু ঘুরতে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আকাশের রঙ কেমন সবুজ দেখাচ্ছে। গুমোট অফিস-ঘর থেকে বেরুতে পারাটাই একটা আরাম। বেশিক্ষণ কিন্তু বাইরে থাকা হল না। কয়েকটা আলু সেদ্ধ চড়াতে হবে, সোজা তাই বাড়ি ফিরলাম।

হল-ঘরটা অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় সালামানোর সঙ্গে প্রায় ধাক্কাই লাগছিল আর একটু হলে। আমি যে তলায় থাকি সালামানোর ঘরও সেই তলায়।

রোজকার মত সে তার কুকুর নিয়ে বেরুচ্ছে। আট বছর ধরে তাদের ছাড়াছাড়ি কখনো

হয়নি। কুকুরটা স্প্যানিয়েল জাতের—বিশ্রী লোম-ওঠা ঘেয়ো চেহারা। একটা ছোট ঘরে এক সঙ্গে নিত্য থাকার দরুন সালামানোর চেহারাটাও যেন কুকুরটার মত হয়ে গেছে। মাথার-চুল পাৎলা, মুখে লালচে সব কি দাগ। কুকুরটাও যেন মনিবের মত কুঁজো হয়ে হাঁটে। হাঁটবার সময় নাকটা মাটিতে ঠেকানই থাকে। কিন্তু এত মিল থাকলে কি হয় মনিব আর কুকুর পরস্পরের দু-চক্ষের বিষ। দিনে দুবার, সকালে এগারটায় আর সন্ধ্যা ছটায় সালামানো কুকুরটাকে বেড়াতে নিয়ে বেরোয়। আট বছর ধরে এ নিয়মের বদল হয়নি।

রু দ লিয়-তে দুজনকে যথাসময়ে রোজ দেখা যাবে। চেন-বাঁধা কুকুরটা মনিবকে প্রাণপণে টানতে টানতে চলেছে। সিঁড়িতে পা হড়কে সালামানো প্রায় পড়ে আর কি! সামলে নিয়ে সালামানো গাল দিতে দিতে কুকুরটাকে ঠেঙায়। কুকুরটা ভয়ে কুঁকড়ে এবার পিছিয়ে পড়ে থাকে। মনিবকেই এবার খানিকক্ষণ তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সে খানিকক্ষণ মাত্র। খানিকবাদেই আবার সব ভুলে গিয়ে কুকুরটা আবার আগে আগে টানতে টানতে চলে। আবার ঘুরে ঘুরে সেই একই মার আর বকুনি খাওয়ার পালা।

তারপর ফুটপাথের ধারে তারা দাঁড়ায়। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। কুকুরটার চোখে ভয় আর মনিবের ঘৃণা।

রোজ রোজ সেই একই ব্যাপার। কুকুরটা ল্যাম্প পোস্ট দেখে দাঁড়াতে চাইলেও সালামানো তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে। ফোঁটা ফোঁটা জলের একটা রেখা তাই তার পেছনে পেছনে আঁকা হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে গিয়ে কিছু করার শাস্তিও সেই ঠেঙানি।

আট বছর ধরে এই রকম চলে আসছে। সিলেস্তে প্রায় বিরক্তি জানায়—"কি বিশ্রী ব্যাপার! একটা কিছু বিহিত করতে হয়!" কিন্তু সে বিষয়েও ঠিক কিছু করা যায় না।

হলে যখন দেখা হল সালামানো তখন কুকুরটাকে গাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে—বেজন্মা ঘেয়ো লেড়ি কুত্তা, এমনি আরো কত কি! কুকুরটা থেকে থেকে কেঁউ কেঁউ করে উঠছে।

আমি সম্ভাষণ জানালাম কিন্তু সালামানোর ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখন কুকুরটাকে গালাগাল করতেই ব্যস্ত।

কুকুরটার অপরাধটা কি জানতে চাইলাম এবার। তাতেও কোন উত্তর নেই। "পাজি নচ্ছার কুকুর"—ইত্যাদি গালাগালই চলল।

অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হল কুকুরটার গলার কলারে কি যেন একটা সে লাগাচ্ছে।

গলা একটু চড়িয়ে সেই এক প্রশ্নই করলাম। আমার দিকে না ফিরে চাপা রাগে সে বিড়বিড় করে বললে—"জাহান্নমে যাক অমন কুকুর। সারাক্ষণ জ্বালাচ্ছে!"

সিঁড়ি দিয়ে এবার সে উঠতে শুরু করল। কিন্তু কুকুরটা কিছুতেই যাবে না। মেঝের ওপর চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে সে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল। সালামানোর তখন চেন ধরে তাকে প্রতিটি ধাপ হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে না গিয়ে উপায় কি!

ঠিক সেই সময় আর একটি লোক নিচের রাস্তা থেকে এসে ঢুকল। লোকটি আমাদের দো-তলাতেই থাকে। অনেকেরই এখানে ধারণা লোকটা দেহোপজীবিনীদের দালাল। জিজ্ঞেস করলে সে অবশ্য জেটির গুদামেই কাজ করে বলে। এ কথাটা অবশ্য ঠিক যে আমাদের পাড়ায় তাকে পছন্দ কেউ বড় করে না।

আমার সঙ্গে কিন্তু মাঝে মাঝে সে দু-চারটে কথা বলে। কখনো সখনো আমার ঘরেও এসে বসে একটু আধটু আলাপ করতে, কারণ আমি তার কথা শুনি। সত্যি কথা



বলতে কি, তার কথাবার্তা শুনতে আমার ভালোই লাগে। সুতরাং তার ওপর নাক সিঁটকে থাকার কোনো কারণই আমার নেই।

লোকটার নাম সিল্তেস, রেমণ্ড সিল্তেস। বেঁটে গাট্টা-গোট্টা চেহারা, নাকটা ঘুঁসোঘুঁসি যাদের পেশা তাদের মতো থ্যাবড়ান। পোশাকে-আসাকে কিন্তু খুব ফিটফাট। সেও একবার সালামানো সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিল, "কি ঘেন্নার ব্যাপার!" কুকুরটার সঙ্গে বুড়ো যে রকম ব্যবহার করে তাতে আমি বিরক্ত হই কিনা তাও জিজ্ঞাসা করেছিল। বিরক্ত হই না, বলেছিলাম।

দু-জনে এক সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। আমার ঘরের দরজায় ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সিল্তেস বললে,—"শুনুন! আমার সঙ্গেই এ-বেলা খান না। কালো পুডিং আর মদ আছে।"

ভাবলাম, মন্দ কি! আমার এ-বেলা তাহলে আর রাঁধতে হয় না। "ধন্যবাদ" বলে সম্মতি জানালাম।

তারও একটিমাত্র ঘর আর সেই সঙ্গে একটা রান্নাঘর—তার আবার জানলার বালাই নেই। ওর বিছানার মাথায় শাদা গোলাপী প্ল্যাস্টারের একটি দেবদূতের মূর্তি। অন্যদিকের দেয়ালে কয়েকটা সেরা সেরা খেলোয়াড় আর উলঙ্গ মেয়ের ছবি আঁটা। বিছানাটা পাতা হয়নি, ঘরটাও নোংরা।

সে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালল, তারপর একটা ময়লা ব্যাণ্ডেজ পকেট থেকে বার করে ডান হাতে জড়াল।

জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? সে জানালে কার সঙ্গে যেন মারামারি করেছে। লোকটা নাকি তাকে চটিয়েছে।

সিল্তেস আরো বিশদ করে বললে, "আমি শখ করে ঝামেলা খুঁজি না। তবে আমি একটু রগচটা। লোকটা আমায় রোক দেখিয়ে বললে, মরদ হলে নেমে আসুন ট্রাম থেকে।" বললাম, "মাথা ঠাণ্ডা করুন, আপনার কি করেছি আমি।" তাতে বলে কিনা আমার সাহস নেই। বাস তাইতেই মেজাজ গেল বিগড়ে। ট্রাম থেকে নেমে বললাম, "কথাটি আর বোলো না, নইলে একটি ঘুঁসিতে মুখ বন্ধ করে দেব।" তাতে বললে—"দেখি-ই না কত মুরোদ।" এবার একটি ঘুঁসি মুখে ঝাড়লাম। তাতেই জমি নিলে। একটু দেখে তাকে তুলতে গেলাম তাতে শুয়ে শুয়েই লাথি ছুড়লে। হাঁটুর একটা গুঁতো দিয়ে আরো দু-ঘা কসালাম। তখন রক্তে ভাসছে কাটা শুয়োরের মতো। শুধোলাম, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে কিনা। বললে, "হ্যাঁ, হয়েছে।"

বিছানায় বসে সিল্তেসের কথা শুনছিলাম। সে ব্যাণ্ডেজটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বর্ণনা দিচ্ছিল মারামারির।

"বুঝলেন তো!" সে বললে, "আমার কোনো দোষ নেই সেই সাধ করে হ্যাঙ্গামা ডেকেছে, কেমন তাই না?"

মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলাম।

সে বললে, "আপনাকে তাহলে আসল কথাটা বলি,—একটা বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ চাই। এই ব্যাপারটার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। আপনি তো অনেক কিছু দেখেছেন শুনেছেন, আপনি নিশ্চয় আমায় একটা উপায় বাৎলাতে পারেন। তাহলে আমি আপনার সারা জীবনের দোস্ত হব। আমার ভালো কিছু যে করে আমি তাকে জীবনে ভুলি না।"

আমি কিছু না বলাতে সে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার সঙ্গে দোস্তী করতে চাই কিনা! বললাম, আমার কোনো আপত্তি নেই। এ জবাবেই সে সন্তুষ্ট হল মনে হল।

কালো পুডিং-এর থালাটা বার করে সে ফ্রাইং প্যানে সেটা রেঁধে নিলে। তারপর টেবিল সাজিয়ে দু বোতল মদ সেখানে রাখল। এ সব কাজ সে নীরবে সারল।

খেতে বসবার পর একটু ইতস্তত করে সে তার সমস্ত গল্পটাই বলতে শুরু করলে।

"ব্যাপারটা নারী-ঘটিত,—যেমন হয়। তাকে নিয়ে অনেক রাতই কাটিয়েছি। আমারই রক্ষিতা। সত্যি কথা বলতে কি আমার বেশ দু-পয়সা খস্‌ত তার জন্যে। যাকে আজ মেরেছি সে তারই ভাই।"

আমি চুপ করে আছি দেখে সিন্তেস আবার বললে, পাড়াপড়শীরা তার সম্বন্ধে কি বলে সে জানে। কিন্তু কথাটা ডাহা মিথ্যে। ন্যায় অন্যায় সেও মানে আর সবাইকার মত, জেটির গুদামে সে কাজও করে।

"হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম," সে বলে চলল, "একদিন টের পেলাম যে মেয়েটা আমার চোখে ধুলো দিচ্ছে..."

সিন্তেস তাকে বাজে খরচ না করে চালাবার মতো যথেষ্ট টাকাই দিত বললে। তার ঘর-ভাড়া আর খাই খরচা দিন কুড়ি ফ্রাঙ্ক।

"ভেবে দেখুন ঘর-ভাড়া আর খাই-খরচা মাসে ছ'শ ফ্রাঙ্ক! তার ওপর এখন তখন এটা সেটা উপহার, যেমন এক জোড়া মোজা কিংবা আর কিছু। দাঁড়াল গিয়ে তাহলে প্রায় হাজার ফ্রাঙ্ক। কিন্তু তাতেও বিবি সাহেবের চলে না। রাতদিনই ঘ্যানঘ্যান করতো যে আমি যা দিই তাতে নাকি তার কিছুতেই কুলোয় না।"

একদিন তাই বললাম—"ঘণ্টা দু-একের একটা কাজ জুটিয়ে নাও না কেন? তাতে আমারও সাশ্রয় হয়। এই মাসেই একটা নতুন পোশাক কিনে দিয়েছি। তোমার ঘর-ভাড়া আমিই দিই আর তোমার খাবার খরচা। কিন্তু তুমি কাফে-তে এক পাল মেয়ে নিয়ে গিয়ে পয়সা ওড়াও। চিনি-দেওয়া কফি খাওয়াও তাদের! আর পয়সাটা অবশ্য আমার পকেট থেকেই যায়। আমি তোমার জন্যে যা করি এই তার প্রতিদান! কিন্তু সে কাজ নেওয়ার ধার দিয়েও যায় না। আমি যা দিই তাতে চলে না এই শুধু নালিশ। তারপর একদিন টের পেলাম কি ঠকান আমায় ঠকাচ্ছে!"

সিন্তেস এবার বলতে থাকে কি করে একদিন মেয়েটির ব্যাগে একটা লটারি টিকিট দেখে কেনবার টাকা কোথায় পেয়েছে—সে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটা কিছুতেই নাকি বলতে চায়নি। তারপর আরেক দিন দুটো রেসলেট বন্ধক দেওয়ার রসিদ তার কাছে পায়। সে রেসলেট সিন্তেস কিন্তু চোখেও কখনো দেখেনি।

তলে তলে যে শয়তানী চলেছে, আমি তখনই বুঝলাম আর তাকে বলেও দিলাম যে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার শেষ। প্রথমে অবশ্য তাকে বেশ কয়েক ঘা দিলাম, শুনিয়েও দিলাম সাফ্‌ সাফ্‌ কয়েকটা কথা। বললাম যে সুবিধে পেলেই যে কোনো পুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস করা ছাড়া আর কিছুতে তার মন নেই। তাকে স্পষ্ট বুঝিয়েও দিলাম, "একদিন তোমায় আফশোস করতে হবে, বুঝেছ সুন্দরী, তখন সাধ হবে আবার আমায় ফিরে পেতে। আমার মতো লোকের হাতে আছ বলে তোমায় রাস্তার সব মেয়ে হিংসে করে তা জানো!"

রেমণ্ডের কথায় জানা গেল রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত সেদিন সে মেয়েটাকে মেরেছে।



আগে কখনো তাকে নাকি মারে নি।

"অন্তত এমন রাগের মার নয়, আদরের মতো দু-এক ঘা দিয়েছি মাত্র। সে তাতে একটু-আধটু কান্নাকাটি চেঁচামেচি করেছে, আমি জানলা বন্ধ করে দিয়েছি। তারপর সে সব ঝগড়া যথারীতি মিটে গেছে। কিন্তু এবারে আর তা হচ্ছে না। কোনো সম্পর্ক আর আমি ওর সঙ্গে রাখব না। শুধু মনে হচ্ছে ঠিক মতো সাজা ওকে দিতে পারিনি! আমার কথাটা বুঝতে পারছেন?"

এবার কথাটা সে বুঝিয়ে বললে। এই জন্যেই সে আমার পরামর্শ চায়।

লণ্ঠনটায় ধোঁয়া উঠছে। সে পায়চারী থামিয়ে পলতেটা একটু নামিয়ে দিলে। কোনো জবাব না দিয়ে আমি তার কথা শুনে যাচ্ছিলাম। গোটা একটা বোতল মদ আমার পেটে গেছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। নিজের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বলে আমি রেমণ্ডের সিগারেটই খাচ্ছিলাম। শেষ দিকের কটা ট্রাম চলে যাওয়ার পর—রাস্তা নিস্তব্ধ হয়ে এল। রেমণ্ড তখনো তার কথা বলে চলেছে। তার জ্বালাটা এই, যে মেয়েটার ওপর তার কেমন টান পড়ে গেছে। তবু সে তাকে সায়েস্তা করবে-ই।

প্রথমে সে ভেবেছে, মেয়েটাকে একদিন কোনো হোটেলে নিয়ে গেলে পুলিশ ডাকিয়ে আনাবে। পুলিশকে বলবে সাধারণ বেশ্যা বলে তার নাম রেজেস্ট্রীতে তুলে নিতে। সে তাইতেই তাহলে ক্ষেপে যাবে।

এরপর সে গুণ্ডা বদমাসদের দলের দু-চারজন আলাপীর কাছে পরামর্শ চেয়েছে। নিজেদের কাজ বাগাতে ও ধরনের মেয়ে তারা হাতে রাখে। তারাও কোনো মতলব বাংলাতে পারেনি। কিন্তু তাদেরই এসব জানা উচিত। নেমকহারামী যে করেছে এমন মেয়েকে সিধে করবার উপায়ই যদি না জানে তাহলে গুণ্ডা বদমাস হওয়া কেন? এ কথা তাদের বলায় তারা পরামর্শ দিলে মেয়েটাকে ছাঁকা দিয়ে দাগী করে দেবার। কিন্তু সেটাও তার পছন্দ নয়। ব্যাপারটা আরো ভাবতে হবে...তবে প্রথমে সে আমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়, আর তা জিজ্ঞেস করবার আগে সমস্ত গল্পটা শুনে আমার কি মনে হল তা তার জানা দরকার।

বললাম, "মনে আমার তেমন কিছু হয়নি তবে শুনতে আগ্রহ হয়েছে।"

মেয়েটা তার সঙ্গে সত্যি শয়তানী করেছে বলে আমি মনে করি কি না?

স্বীকার করলাম যে ব্যাপারটা সেই রকমই মনে হয়।

তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না, আর তার জায়গায় আমি হলে কি করতাম।

বললাম যে এরকম অবস্থায় কি করা উচিত ঠিক করা শক্ত। তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছেটা বুঝতে পারি।

আরো খানিকটা মদ খেলাম। রেমণ্ড তখন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে কি সে করতে চায় আমাকে বোঝাচ্ছে।

সে তাকে একটা কড়া চিঠি লিখতে চায়, এমন চিঠি যাতে মেয়েটি বিচ্ছিরি জ্বালায় জ্বলবে আবার নিজের ভুল বুঝে আফশোষও করবে। তারপর সে আবার রেমণ্ডের কাছে ফিরে এলে রেমণ্ড তাকে নিজের বিছানাতেই জায়গা দেবে। তারপর সে যখন আদরে বেশ গলে উঠেছে তখন মুখে থুতু দিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দেবে।

মতলবটা মন্দ নয় স্বীকার করলাম। শাস্তি এতে তার বেশ হবে।

রেমণ্ড বললে যে ঠিক এই ধরনের চিঠি লেখা তার আসে না। এই ব্যাপারেই সে

আমার সাহায্য চায়।

আমি চুপ করে থাকায় সে জিজ্ঞাসা করলে তখুনি একটা চিঠি লিখে দিতে আমি রাজী কি না।

বললাম—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এক গ্লাস মদ শেষ করে সে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর প্লেট আর পুডিং-এর টুকরোগুলো সরিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করলে। অয়েল ক্লথটা ভালো করে মুছে সে তার বিছানার ধারের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চৌকো কাগজ নিয়ে এল। তারপর আনলে একটা খাম, একটা লাল কলম আর বেগুনি কালিভরা একটা দোয়াত।

এবার মেয়েটার নাম বলামাত্র আমি বুঝলাম যে সে মুর।

চিঠিটা লিখে ফেললাম। তেমন কিছু ভেবে-চিন্তে লিখলাম না। শুধু রেমণ্ডকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই লেখা। সন্তুষ্ট করব নাই বা কেন!

লিখে চিঠিটা পড়লাম। সিগারেটটা টানতে টানতে রেমণ্ড সবটা শুনল। মাঝে-মাঝে মাথাও নাড়ল তারিফ করতে।

"আরেকবার পড়ো তো?" সে অনুরোধ করলে। মনে হল বেশ খুশি হয়েছে।

"আরে এই তো চাই!" চিঠিটা আবার শোনার পর তার গলায় খুশি ছলকে উঠল, "দেখেই আমি ধরেছি তোমার মাথায় ঘিলু আছে, দোস্ত! সব একেবারে সাফ্-সাফ্ বোঝ।"

"দোস্ত" বলার অন্তরঙ্গতা প্রথমটা তেমন লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য করলাম, হঠাৎ আমার কাঁধ চাপড়ে যখন সে বললে,—"তাহলে এখন থেকে আমরা দোস্ত, কি বলো?"

আমি চুপ করে রইলাম। সে আবার সেই কথাই বললে।

দোস্ত হই বা না হই আমার কাছে সবই এক। কিন্তু তার পেড়াপীড়ি দেখে সায় দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ।"

চিঠিটা সে খামে ভরল। বাকি মদটা আমরা শেষ করলাম। তারপর কোনো কথা না বলে খানিকক্ষণ সিগারেট খেতে লাগলাম দুজনে।

রাস্তাটা এখন প্রায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু একটা গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ।

খানিক বাদে আমি জানালাম যে বেশ রাত হয়ে গেছে।

রেমণ্ড সায় দিয়ে বললে, "আজ যেন সময়টা দেখতে দেখতে কেটে গেল।"

কথাটা সত্যি।

বিছানায় গিয়ে শুতে পারলে আমি তখন বাঁচি, কিন্তু উঠে ঘরে যাওয়াটাও যেন কষ্টকর। আমাকে নিশ্চয় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল কারণ রেমণ্ড বললে, "কোনো কিছুতেই ভেঙে পোড়ো না।"

প্রথমে তার কথার মানেটা বুঝতে পারিনি। তারপর সে বুঝিয়ে বললে যে আমার মার মৃত্যুর কথা সে শুনেছে। তবে এ শোক তো একদিন না একদিন পেতে-ই হয়।

তার কথাটা ভালো লাগল। তাকে তা জানালামও।

আমি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে রেমণ্ড আমার সঙ্গে সাদরে করমর্দন করে বললে যে পুরুষেরা পরস্পরকে বোঝে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে ওপরের সিঁড়িতে খানিক দাঁড়ালাম।

সমস্ত বাড়িটা কবরখানার মতো নিস্তব্ধ। সিঁড়ির ফাঁকের গর্ত থেকে একটা ভাপসা গন্ধ উঠছে।

নিজের কানের রক্ত-চলাচলের দপদপানি ছাড়া আর কিছু আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই শুনলাম।

তারপর সালামানের ঘরে কুকুরটা গোঁয়াতে শুরু করল। ঘুম-জড়ানো বাড়িটার ভেতর দিয়ে সেই ক্ষীণ কাৎরানি ধীরে ধীরে উঠতে লাগল—যেন নিঃশব্দ অন্ধকারের একটা ফুল।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র [ ক্রমশঃ ]

# নৈরাজ্যবাদ : প্রাচীন যুগ

**অতীন্দ্রনাথ বসু**

### ২। ভারতবর্ষ : কৃতযুগের স্বপ্ন

"পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ভারতবর্ষের কোন জায়গা নেই"—কারণ ভারতীয় মনীষা বিচরণ করেছে অধ্যাত্মদর্শনের সূক্ষ্মলোকে। কথাটা বলেছিলেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুয়েলর একশ বছর আগে।[১] বহুকাল ধরে ইয়োরোপের পণ্ডিতরা একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধারণার জন্মদাতা জার্মান দার্শনিক হেগেল। তাঁর কাছে রাষ্ট্র-ইতিহাস ছিল বিশ্ব-প্রজ্ঞানের ক্রমবিকাশ, এর শিশু অবস্থায় আবির্ভাব হয়েছিল প্রাচ্য রাষ্ট্রের, তথা ভারতীয় রাষ্ট্রের—যেখানে প্রজ্ঞান শিশুর মত তন্দ্রাতুর। সেই থেকে পাশ্চাত্ত্য সুধীসমাজে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শন অথবা শাসন-প্রণালী গড়ে ওঠেনি। বিশ্বাসটা যে ভ্রান্ত তা গত একশ বছরের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নবিদরা দেখিয়েছেন যে এই অধ্যাত্মের দেশেও রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও সংগঠনের নানারূপ নিরীক্ষা ও পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু পূর্বসূরীদের রাষ্ট্রপ্রতিভার প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করবার কালে প্রাচীন চিন্তার একটা বিশেষ ধারা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—যে চিন্তাধারা কোন প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি, যার ধ্যান ছিল নিরাজ সমাজ—যেখানে বিত্ত বর্ণ ও শ্রেণীর কোন রকম ভেদাভেদ নেই।

মহাভারত ও পালিগ্রন্থে এক অতি প্রাচীন স্বর্ণযুগের বর্ণনা আছে,—যে যুগে সমাজ ছিল একবর্ণ, সকলেই ছিল দেব বা ব্রাহ্মণ, যেখানে নারী পুরুষের পণ্য নয়, যেখানে অধিকার ভেদ নেই, মানুষমাত্রই অমম, অপরিগ্রহ, কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়,—এবং তাদের পুণ্যফলে মেঘ যেখানে কালবর্ষী, শস্য যেখানে রসবান। দেববাঞ্ছিত এই পুরাকালের নাম কৃতযুগ বা সত্যযুগ। হিমালয়ের পরপ্রান্তে আছে উত্তরকুরুর মায়ালোক। পুণ্যফলভোগীরা এখনও সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দের ক্রোড়ে জীবন যাপন করেন (দীঘনিকায়, ৩২.৭; মহাভারত ৬.৬.১৩)[২]

ইতিহাসে কোনকালে কোন স্বর্ণযুগ হয়নি, হয়ও না। সংঘাত-ও সংগ্রাম-সঙ্কুল জীবনে অবিরাম শান্তি ও সমৃদ্ধির কল্পনা মরীচিকার মত স্বপ্নদর্শীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু ইতিহাসের নির্মম আঘাতে তার কল্পনা ভেঙে যায়। তখন সে তার মনের রঙে রাঙিয়ে তোলে অতীত,—দূর অতীতের কোন অজ্ঞাত অধ্যায়, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না। সেই প্রাক্‌প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে স্বপ্নতুলির আঁচড়ে সে ফুটিয়ে তোলে এক অবাস্তব স্বর্ণযুগ।

কেমন করে এই স্বর্ণশ্রী ম্লান হয়ে গেল, স্বভাবের সন্তান অপাপবিদ্ধ মানুষ ভেদ-বৈষম্যে বিধ্বস্ত হল এই জিজ্ঞাসা নিয়ে কৃতযুগের অনুধ্যানী স্বপ্নচারীরা সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

---

১ হিস্ট্রী অব এনসিয়াণ্ট সন্‌স্‌ক্রিট লিটরেচর, ১৮৫৯, ৩১ পৃষ্ঠা।

২ মহাভারতের যাবতীয় উদ্ধৃতি কুম্বকোনম সংস্করণ থেকে নেওয়া।



দীঘনিকায়ের অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্তন্তে এই প্রশ্নের উত্তরে আর এক কাহিনীর অবতারণা হয়েছে। আদিতে এই আনন্দধামে কামনা ও লালসা ছিল না, বিত্ত ও রাষ্ট্র ছিল না। তারপর এল যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং তার ফলে পরিবার ও গৃহ। সেই সঙ্গে দেখা দিল লোভ, মাটির ফসল সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি। পরিণামে সর্বসাধারণের কৃষিক্ষেত্র বিভক্ত হয়ে গেল, এল ব্যক্তি-অধিকার।

> "আমরা শালিক্ষেত্রগুলি ভাগ করিয়া ফেলি এবং পরস্পরের সীমানা স্থির করিয়া দিই। এই বলিয়া তাহারা শালিক্ষেত্র ভাগ করিয়া ফেলিল এবং সীমানা স্থাপন করিল" ১৮।

ব্যক্তিস্বামিত্বের সাথী হয়ে এল চৌর্য (অদিন্নাদান), গর্হিত কার্য (গরহ), মিথ্যাবাদ (মুসাবাদ) ও দণ্ডদান। বিবাদের নিষ্পত্তি করবার জন্য একজন সালিশের প্রয়োজন হল। সুতরাং সকলে এক জনসভায় সম্মিলিত হয়ে এক মহাজনকে নির্বাচন করল। তাঁর উপর ন্যস্ত হল চুরি ও মিথ্যাকথনের অপরাধে ধিক্কার ও দণ্ডদানের ভার, বিনিময়ে তাঁকে তারা শালির কিছু অংশ নিবেদন করল।

মহাভারতের শান্তিপর্বে কয়েকটি ছত্রে প্রাচীন নিরাজ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সততায় অধিষ্ঠিত অবাধ মুক্তিতে উচ্ছ্বসিত সেই সহজ জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রশাসিত কৃত্রিম জীবনের পার্থক্য আমূল।

> "তখন না ছিল রাজ্য, না ছিল রাজা, না দণ্ড বা দাণ্ডিক; প্রজারা স্বভাবধর্মে পরস্পরকে রক্ষা করত" (৫৮. ১৪)।
>
> "পুরাকালে ধিক্কার ছিল দণ্ড। তারপর এল বাগ্‌দণ্ড, তারপর আদানদণ্ড (অর্থদণ্ড)। এখন বধদণ্ডের প্রবর্তন হয়েছে" (২৭৩.১৯)।
>
> "পুরাকালে সংহতভাবে ধর্মাচরণ করে তারা সুখে বাস করত। বিচার করবার মত কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করবার মত তাদের কিছু (বিবাদ কিংবা অপরাধ) ছিল না" (২৭৬. ১১)।

কৃতযুগের কবিকল্পনার পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক সত্যের আভাস আছে। স্বভাবশুদ্ধ অকৃত্রিম একবর্ণ সমাজ বস্তুত শিলাযুগের জাতিযূথ, জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ, গোত্রনিয়মে শৃঙ্খলিত। সে যুগে রাষ্ট্র ছিল না, দেশ ছিল না—ছিল জাতি বা বিশ্‌। পুরাবৈদিক সমাজের কেন্দ্র ছিল বিশ্‌ বা জাতিযূথ। এদের কয়েকটি সম্মিলিত হয়ে গঠন করত জন বা গণ—যেমন যদু, তুর্বশ, পুরু, অনু ইত্যাদি। এদের কোন স্থায়ী দেশ বা ভূমি ছিল না। রাজসূয় যজ্ঞ করে যাঁরা রাজচক্রবর্তী হতেন তাঁদের অধিকার কোন দেশের ওপর স্থাপিত হত না, স্থাপিত হত ভরত, কুরুপঞ্চাল ইত্যাকার গণদের ওপর। তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে যজ্ঞকর্তা রাজা বিশ্‌-এর অধিপতি হন, রাষ্ট্রের নয় (২. ৩. ৩-৪)। ব্রাহ্মণ রচনার কালে বিশ্‌ ও গণরা বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল এবং তখন পরিপূর্ণ বিকাশ হল ভূমি-আশ্রিত রাষ্ট্রের (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭. ৩. ১৪)।

অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্তন্তের আখ্যানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের জন্মের আগে উদ্ভব হয়েছিল সম্পত্তি প্রথার। এ অনুমান অসঙ্গত নয়। আদিম জাতিযূথের জীবিকা ছিল শিকার। এর উদ্যোগ ও ভোগ উভয়ই ছিল যৌথ। ক্রমে উন্নততর অর্থবিদ্যা আয়ত্ত হল—এল পশুপালন ও কৃষি। এ বৃত্তি অনায়াসসাধ্য, একক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং ক্রমে যৌথ উদ্যোগের জায়গায় এল ব্যক্তিপ্রয়াস। গাভী ও ক্ষেত্র হল ব্যক্তিসম্পত্তি।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও এই প্রাক্‌রাষ্ট্র যুথসমাজের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় সিন্ধুনদের উপত্যকায়। আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী লিপিকাররা এখানে মৌসিকন (মূষিকগণ) নামে এক জাতির সাক্ষাত পেয়েছিলেন। এঁদের নজির অবলম্বন করে মৌসিকনদের সম্বন্ধে যখন লেখক স্ট্রাবো তাঁর ভূগোলে লিখেছেন :

> "এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এইগুলি। স্পার্টানদের মত এরা একসঙ্গে বসে প্রকাশ্যে ভোজন করে। শিকার করে যা পায় তাই এদের খাদ্য। যদিও এদের সোনা ও রুপার খনি আছে তবুও এরা এইসব ধাতু ব্যবহার করে না।"

সিন্ধু-উপত্যকার আরও কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে স্ট্রাবো লিখেছেন যে তারা যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং ফলনের পর প্রত্যেকে এক বছরের মত ফসল ঘরে নিয়ে যায় (১৫. ১. ৬৩)। দীঘনিকায়ের মত ঋগ্‌বেদেও ইঙ্গিত আছে যে যৌথবিত্তকে ভাগ করেই ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে (৪. ৫৪. ১)। শুক্ল যজুর্বেদের টীকাকার মহীধর 'অদিতি' শব্দের অর্থ করেছেন 'অখণ্ডিতা অখণ্ডিতায়াঃ পৃথিব্যাঃ, ৪. ২২)। এ অনুমান কিছু অসঙ্গত নয় যে যে সমাজে ব্যক্তিস্বামিত্ব ছিল না, সে সমাজে রাজা ও রাজবিধিও ছিল না। মৌসিকনদের সম্বন্ধে স্ট্রাবো বলেছেন যে "হত্যা ও ধর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কাজের বিরুদ্ধে এদের কোন দণ্ডবিধি নেই।" কচ্ছের কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে প্লিনি লিখেছেন, "এরা স্বাধীন এবং এদের কোন রাজা নেই।"[৩]

কেমন করে সত্যযুগের মানুষ তার শুদ্ধ আনন্দময় জীবন থেকে ভ্রষ্ট হল তার একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা শান্তিপর্বেও আছে। নৈতিক অধঃপতনের ফলে তারা মোহগ্রস্ত হল, দেখা দিল লোভ ও ক্রোধ। তাদের আত্মবিরোধ থেকে রক্ষা করবার জন্যে ঈশ্বর পাঠালেন রাজাকে হাতে রাজদণ্ড দিয়ে। দীঘনিকায়ের গল্পেও পরিণাম একই শুদ্ধ পথ ভিন্ন। লালসা থেকে এল পরিবার, সঞ্চয়বৃত্তি থেকে সম্পত্তি। পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যে 'মহাজনসম্মত' হয়ে অর্থাৎ সর্বজনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এলেন বৃত্তিভোগী রাজা।[৪]

যুথসমাজকে চূর্ণ করে বর্ণভেদ, ব্যক্তিসম্পত্তি ও রাষ্ট্রশাসনের আবির্ভাব বেদের পৃষ্ঠায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। এ পর্ব প্রাগৈতিহাসিক। কিন্তু নিরাজ সমাজের কল্পনা, নৈরাজ্যবাদী আদর্শ, হাজার হাজার বছর পরেও বিলুপ্ত হয়নি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের ধর্মশাস্ত্রে মুখবন্ধে এই আদর্শকে স্মরণ করা হয়েছে।

> "পুরাকালে মানুষ ছিল ধর্মপরায়ণ ও অহিংস। পরে তাহারা লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হইল। তখন হইল ব্যবহারের (বিচার বিধির) প্রবর্তন" (বৃহস্পতি, ১. ১)।
>
> "যখন মানুষ স্বধর্মে নিবদ্ধ থাকিত এবং স্বভাবত সত্যাচরণ করিত তখন স্বার্থপরতা ও ঘৃণার লেশমাত্র ছিল না—ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। মানুষের মধ্য হইতে ধর্মাচরণ চলিয়া যাইবার পর ব্যবহারের প্রবর্তন হইল এবং ব্যবহারের প্রয়োগ ও দণ্ডদানের ক্ষমতা লইয়া নিযুক্ত হইলেন রাজা" (নারদ, ১. ১-২)।

নবম শতকের জৈন দার্শনিক জিনসেনের রচনায়ও এই নিরাজ ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে।

---

[৩] ম্যাকক্রিণ্ডল : শক-এর ফ্রাগমেণ্টস অব মেগাস্থিনিস-এর অনুবাদ, খণ্ড, ৫৬।

[৪] মানুষের নৈতিক অধঃপতন থেকে এল লোভ ও ব্যক্তিসম্পত্তি এবং সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য উৎপত্তি হল রাষ্ট্রের,—এ ধারণার পুনরাবৃত্তি করেছেন প্রথমশতকে সেনেকা এবং চতুর্থ শতকে সেণ্ট অগাস্টিন। এঁদের কথার আলোচনা বারান্তরে হবে।



বস্তুত ঐতিহাসিক কালের ভেদবৈষম্যের পূর্ববর্তী এরূপ একটি শান্তিময় যুগের পরিকল্পনা ভারতীয় ভাবুকদের বৈশিষ্ট্য নয়। চীনের তাও-বাদীরাও যে এমনি একটা মধুর স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা পূর্বে বলা হয়েছে। গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা এই ধারণার শরিক ছিলেন। ল্যাটিন দেশগুলিতেও এর ছায়া পড়েছে স্যাটার্নেলিয়া নামক উৎসবের মাধ্যমে যাতে করে শত শত বৎসর ধরে হারানো দিনের স্বাধীনতা ও মৈত্রী স্মরণ করা হত।[৫]

ভাবুক তার স্বপ্নকে ভোলেনি। কিন্তু কথা হল একে বাস্তব করে তুলবার, নিরাজ সমাজকে ফিরিয়ে আনবার কোন চেষ্টা হয়েছিল কি? পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক জায়গায় অরাজ বা অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে—অবশ্য এদের নিন্দার সূত্রে। সুতরাং বেদোত্তর কালেও অরাজক সমাজের অস্তিত্ব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহ যে থাকলেও সংখ্যায় ও আকারে এরা ছিল নগণ্য এবং প্রতিবেশী শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির লুব্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে টিকে থাকা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে নিরাজ সমাজের ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী।[৬]

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের সমর্থকরা অরাজক ব্যবস্থার স্বাভাবিক দুর্বলতাকে তাঁদের মতবাদের পিছনে যুক্তি হিসাবে খাড়া করলেন। মানুষের সহজাত প্রাকৃতিক জীবনকে তাঁরা চিহ্নিত করলেন সাম্য ও সখ্যের আধাররূপে নয়, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কুটিল আবর্তরূপে। আদিম মানব বন্য ও হিংস্র, তার একমাত্র লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।[৭] প্রাকৃতিক সমাজে তাই দুর্বলের স্থান নেই, সমস্ত অধিকার বলবানের। এখানে চলে মাছের রাজ্যের যুক্তি, যেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে জীবন ধারণ করে। তাই রাষ্ট্রনীতি ও দণ্ডনীতির গ্রন্থে রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত শুরু হল মাৎস্যন্যায়ের উপকথা দিয়ে। মনুর ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকের নীতিসার সর্বত্র আছে একই কাহিনী—কেমন করে মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতার অবসান ঘটল রাজতন্ত্রের আবির্ভাবে, পরিবার সম্পত্তি ও ধর্ম সুরক্ষিত হল, রাষ্ট্রের বিধানে ত্রিবর্গলাভের পথ প্রশস্ত হল। মহাভারতের শান্তিপর্বেও এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন যে কাম, অর্থ ও ধর্ম এই ত্রিবর্গের ফল নির্ভর করে রাজদণ্ডের উপর কারণ এর দ্বারাই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় (১৫. ৬৯)। এই প্রত্যয় হল রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি। এর গুরু হলেন শুক্রাচার্য,—যিনি এরিস্টটলের এর সগোত্র, যিনি বললেন—দণ্ডনীতি সকল শাস্ত্রের মূল এবং এর বিচার ও প্রয়োগের মান হল জনকল্যাণ (কামন্দকের নীতিসার, ৩. ৫)।

দণ্ড ও রাষ্ট্রপ্রভুত্বের মতবাদ থেকে এই অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছু কঠিন হল না যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ন্যায় ও নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। বাতব্যাধি, ভারদ্বাজ, অম্ভীয়গণ এবং সর্বোপরি কৌটিল্য ম্যাকিয়াভেলির ন্যায় প্রচার করলেন যে ব্যক্তিক ও সার্বিক নীতিমান এক নয়। যেহেতু ব্যক্তির মঙ্গল রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যক্তির উপরে, রাষ্ট্রের ন্যায়দণ্ড ব্যক্তির নীতিমান দিয়ে পরিচালিত হবে না।

---

[৫] অস্‌কার জাসি : এনসাইক্লোপীডিয়া অব সোস্যাল সায়েন্সস—'এনার্কিজ্‌ম্'।

[৬] কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল 'হিন্দু পলিটী' গ্রন্থে বলেছেন, "এই গৌরবময় কিন্তু প্রায় অসম্ভব ব্যবস্থা স্থাপন ও চালনা করবার জন্য নিশ্চয় হিন্দু ম্যাট্‌সিনি ও হিন্দু টলস্টয়দের আবির্ভাব হয়েছিল" (৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)।

[৭] প্রাকৃতিক সমাজের দুই বিপরীত চিত্রের সঙ্গে লক্ ও হব্‌স্-এর দর্শনের মিল লক্ষণীয়।

এই নীতিহীন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল অরাজক আদর্শে। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এই আদর্শবাদীরা দাঁড়াতে পারেনি। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে লোকায়তরা চরম বস্তুতত্ত্ববাদ প্রচার করে যেমন অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিল, রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে উগ্র বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য অরাজকদেরও সেই দশা হল। লোকায়তদের মত খণ্ডন করবার জন্য প্রতিপক্ষরা তাদের যে সব বচনের উল্লেখ করেছেন সেই উদ্ধৃতিগুলি হতে লোকায়তদের বক্তব্য যাকিছু জানা যায়—তাদের নিজস্ব কোন রচনা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেরূপ দণ্ডনীতির ধারকরা বিপক্ষের নিন্দাবাদ করবার জন্যে অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—এই কটূক্তি থেকেই জানা যায় যে অরাজক মতবাদটা একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। জৈন আচারাঙ্গসূত্রে সাতরকম অরাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি হল 'অরায়' (অরাজ) যেখানে যাওয়া মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে নিরাপদ নয় (২. ৩. ১. ১০)। মহাভারতে বলা হয়েছে সব রকম রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে অধম হল অরাজক দেশ (১২. ৬৬. ৭)। এখানকার দুর্ভোগ অবর্ণনীয়।

> "যে দেশে রাজা নাই সে দেশে লোকেরা অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া ধ্বংস হয়; যাগযজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম বন্ধ হইয়া যায়; মেঘ বর্ষণ করে না; এবং দেবতারা অন্তর্ধান করেন" (১. ১০৫. ৪৪)।

রামায়ণের এক অধ্যায়ব্যাপী বর্ণনা আরও ভয়ানক। অরাজক জনপদ অভাব ও অনাচার, আপদ ও বিপদের মধ্যে পড়ে উচ্ছন্ন যায়—"এ যেন জলহীন নদী, তৃণহীন অরণ্য, গোপহীন ধেনু" (২. ৬৭. ১০)।

এই বিভীষিকাগুলি নৈরাজ্যবাদীদের দমনে কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রবাদীরা বেশী লাভবান হয়নি। ভারতীয় সমাজসংস্থা দুই চরম মতবাদের মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্র এখানে এক সর্বশক্তিমান দানবীয় আকার ধারণ করতে পারেনি। তার শক্তি ছিল বহুধা বিকেন্দ্রিত। দেশ জুড়ে ছিল গ্রাম, নিগম, শ্রেণী, সঙ্ঘ—তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকারবার নিজেরাই চালাত, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হত না—সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তিরক্ষায় সীমাবদ্ধ। এই আত্মলিক ও বৃত্তি-অবলম্বী প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মুক্ত ও স্বাধীন সহযোগিতার পীঠস্থান—কাল্পনিক অরাজক সমাজের ক্ষীণতম প্রতিচ্ছায়া। এদের স্বাধিকারের ওপর রাজশক্তির কোন এক্তিয়ার ছিল না। এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং কুল, বর্ণ, রাষ্ট্র ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত রাজবিধান দিয়ে নয়, শাস্ত্রবিধান দিয়ে। প্রচলিত লোকধর্মই ছিল ধর্মশাস্ত্রের বিধান এবং এই বিধানকে বলবৎ রাখা ছিল রাজার কর্তব্য। সমাজকে শাসন করত দণ্ড নয় ধর্ম। রাষ্ট্রবাদীরা ধর্মকে দণ্ডের কবলে আনতে চেয়েছিল। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে এইটুকুই নৈরাজ্যবাদীদের সার্থকতা। তাদের স্বপ্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শনে উত্তীর্ণ হয়নি, বাস্তবে রূপায়িত হয়নি—কিন্তু সমাজের বুকে তাদের প্রভাব স্বাক্ষর রেখে গেছে।

## আধুনিক সাহিত্য

কনফুশিয়াসের কথামৃতের মধ্যে লক্ষ্যভেদের কথা দেখেছিলাম। তীরন্দাজ তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সে বাণ লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধল না। তখন তাঁকে নিজের বিজ্ঞানের কাছেই পুনরায় ফিরে যেতে হয়; নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, নিজেকেই বিচার করতে হয়, নিজের সামর্থ্যের ত্রুটি নিজেকেই শুধরে নিতে হয়। কনফুশিয়াস বলেছিলেন যে, সংসারে একদল লোক আছেন যাঁরা কর্তব্যজ্ঞানে যথোচিত সমৃদ্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন,—আর-এক দলকে সেটা অনেক কষ্টে দিনে-দিনে পেতে হয়, ঠেকে শিখতে হয়। কিন্তু যেভাবেই হোক সে জ্ঞান একবার যখন আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন আর ভাবনা থাকে না—কারণ, কেউ সেটা সহজে মেনে চলে, কেউ বা প্রচুর প্রয়াসে।

কবিতার জন্মরহস্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো আজও সম্ভব হয়নি, সত্যি। কবিদের লক্ষ্যভেদ-ব্যাপারটা কি নিছক প্রেরণা, না-কি ঐকান্তিক প্রয়াস? সে কি সজ্ঞানে শব্দ, ছন্দ, রূপক ইত্যাদির বিন্যাস, চর্চা, সম্ভোগ,—না-কি অজ্ঞানে বিশেষ বিভূতি-লাভ? কবি অপার কাব্যসংসারে প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো নিরঙ্কুশ,—না-কি তিনি পাঠকের প্রত্যাশী, সামাজিকের সমবেদনা-প্রার্থী? বাংলা কবিতার গত বিশ-পঁচিশ বছরের ইতিহাসে একদল পণ্ডিত-কবির ভণিমাগত দুরূহতার ফলে পাঠকরা এ-সব কথা কখনো সরবে জিজ্ঞেস করেছেন, কখনো বা নীরবে। কিন্তু সমাধান অসম্ভব। কারণ, নতুনত্বের নেশা দুর্নিবার। এবং যথার্থ শিল্পরূপের সীমা নির্ণয় করে দেওয়া একমাত্র তাঁদেরই সাধ্য, যাঁরা নিজেরা শিল্পী। পাঠক যেহেতু কবি নন, সুতরাং তিনি উপেক্ষার পাত্র—এই মনোভাব হয়তো কবিদের মজ্জাগত; তাঁরা মুখে না বললেও এরই প্রকাশ দেখা যায় কারো-কারো পাণ্ডিত্যের ঢঙে, কারো-বা ভাবনার ভঙ্গিতে। আরো মুশকিলের কথা এই যে, য়ুরোপে-মার্কিনমুলুকে নতুন নতুন কসরতের অন্ত নেই। আমরা হয়তো সেইদিকেই বেশি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হয়েছি। সত্যিকার বেগবান, বলিষ্ঠ মন চাঞ্চল্য এড়িয়ে যে একেবারেই না-চলতে পারে, তা নয়। কিন্তু যেখানে চারদিকের দৃশ্যাক্ষের দ্রুত বদলে যাচ্ছে, অতীতের দেহভস্মে বর্তমানের নবাঙ্কুর যেখানে খুবই অনিবার্যভাবে দৃশ্যমান,—একটা প্রথা দেখা দিতে-না-দিতেই আরো কচি এবং কাঁচা কোনো কায়দার কনুইয়ের জোরে দুদিনে উৎপাটিত হয়ে যায়,—এবং আর-একটা প্রথা এসে একরাত্রির জোনাকির মতন তখুনি জ্বলে ওঠে, সেখানে সজ্ঞানে নতুন নতুন কায়দা দেখানো একটা ব্যাপক জাতীয় স্বভাবে পরিণত হতে পারে। পশ্চিমে যে হচ্ছে তাই হচ্ছে, সে-কথা নয়। কিন্তু কবিতা লিখতে বসে ভাবনার ধারাচিহ্নের এখানে-ওখানে কিছু-কিছু মুছে দিয়ে বিষয়টি দুর্বোধ্য করে তোলবার খেলা,—দূর, দূর প্রসঙ্গের অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটিয়ে পাঠককে প্রতিকূলভাবে বিচলিত করবার বাসন এবং আরো সব বিচিত্র নতুনত্বের উৎপাত সে-দেশে কম ঘটেনি। তবু, এসব অভ্যাস থেকেও সেখানে শক্তিমান কবির অভ্যুদয় ঘটছে। ইংরেজী বা ফরাসী যাঁদের মাতৃভাষা নয়, তাঁরা এসব ভাষার যৎসামান্য বিদ্যা অর্জন করেই কি সে-সব অভ্যুদয়ের যথার্থ স্বাদ পেতে পারেন? মধুসূদন বিদেশ থেকেই অমিত্রাক্ষর এনেছিলেন বটে। কিন্তু

সেটা ছিল অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য চাহিদা। ভাবের প্রবাহ যান্ত্রিক অথবা কৃত্রিম কোনো বাধা মানবে না, এটা বুঝতে সেকালেও বিশেষ দেরি হয়নি, যদিও দু-দশ জন তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলেন এবং একা মধুসূদন ছাড়া আর-কারও কলমেই সে ছন্দ ঠিক-মতো ধরা দেয়নি। তাঁর অন্যান্য আমদানির মধ্যে চতুর্দশপদী, মহাকাব্য, আধুনিক নাট্যরীতি ইত্যাদিও একালের অন্যান্য আমদানির তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব শিল্প-প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কিন্তু শুধু কায়দার জন্যেই কায়দা, নতুনত্বের জন্যেই নতুনত্ব—বাংলাদেশের এই নেশা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে 'আধুনিক' কবিদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর মতো প্রথা ভেঙেছেনই বা ক-জন? তাঁর মতো আত্মস্থতা পাওয়া অবিশ্যি ভাগ্যের কথা! কিন্তু শক্তিমান শিল্পীমাত্রেই যে কিছু ভাঙবেন, কিছু গড়বেন,—এবং দর্শক, পাঠক ও শ্রোতার সহযোগিতা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না,—বরং সত্যিকার অভিজ্ঞতার তাড়নায় শিল্পী তাঁর নতুন অধিকার প্রবর্তিত করবেন এবং অন্য পক্ষ সে নতুনত্ব সাগ্রহে মেনে নেবেন,—এটাই তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা! আর যাই হোক, স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষের সঙ্গ প্রীতিকর নয়। জগতে লেনদেন চাই, যোগাযোগ চাই,—আদান না হলে প্রদান ঘটবে কী উপায়ে?

বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে,—দুজন প্রতিষ্ঠিত কবির দুখানি সাম্প্রতিক কবিতা-সংগ্রহ একসঙ্গে হাতে পেয়েই এসব কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এঁদের প্রাবীণ্য আর পরিণতির ভাবনা এখন ভাবতেই হয়,—সেই ভাবনার সঙ্গে গত বিশ-পঁচিশ বছরের কি তারও বেশিদিনের বাংলা কবিতার ভাবনা নিশ্চয় আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত। "শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর"-এর পরে বুদ্ধদেবের "যে-আঁধার আলোর অধিক" বেরুল। আজকাল আর শক্ত কবিতার দিকে বিষ্ণু দে-র মন নেই; তিনি এখন সহজ হয়েছেন,—এ-জনমতের অনুকূল সাক্ষি দেবে "আলেখ্য"। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-জানানো কবিতা এঁরা দুজনেই লিখেছেন। বুদ্ধদেবের এই আলোচ্য বইয়েতেও একটি আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'প্রতিযোগিতার পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়'; তিনি কেবল চেষ্টাই করেছেন বা করে থাকতেন,—রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন অন্তত সেই সব লোকের মনে এরকম ধারণা দেখা দেওয়া কোনোকালেই যে সম্ভব ছিল না, সেকথা বুদ্ধদেব ঠিকই বলেছেন এবং আরো ঠিক বলেছেন—

যেন তুমি কখনো করো নি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।

অথচ চেষ্টার নানান উৎকট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্র-গোধূলি পর্বের খ্যাতিমান 'আধুনিক'দের মধ্যে। সেটা অসঙ্গত হলেও অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে গ্রহান্তরে যেতে হলে একটা বিপরীত উদ্যম দরকার হয়। তাঁরা সেইরকম অভিপ্রায়বশেই নতুন ভঙ্গির উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশকের পরে চল্লিশের দশক গেছে, পঞ্চাশও যায়-যায়! এখন এবং ইতিমধ্যে দেশের এবং বিশ্বের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের বাঁধুনি আজকাল আলগা হয়ে গেছে কিংবা তার ভিত ভেঙে যাচ্ছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব সেই ভিতেই যাঁদের নির্ভর, সেইসব শিল্পীর রচনাতে আমাদের এ পরিবর্তন যে যথেষ্ট চিহ্ন রেখে যাবে, সেটা আশা করা



অনুচিত নয়। বিষ্ণু দে-র "আলেখ্য" সে-বিষয়ে পুনরায় অনুকূল সাক্ষি দেবে। মোট সাতচল্লিশটি কবিতার অনেকগুলিতেই পারিপার্শ্বিক জীবন-সংবাদ আছে,—সে শুধু সংবাদ নয়, আলেখ্য! তাতে ব্যাখ্যা, সংকেত, আত্মজিজ্ঞাসা এবং হৃদয়ের বক্তব্য আছে। উল্টাডিঙি, নাকতলা, শেয়ালদা অঞ্চলের অতি স্থূল, পরিদৃশ্যমান পারিপার্শ্বিকতার (আলেখ্য—৮) কথাই শুধু নয়,—মানুষের অন্তরের কথা আছে, আছে গভীরের প্রতিধ্বনি! যেমন—

শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়।

এবং,

শক্তি বড় ভয়ানক, যে-কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে-কোনো সুযোগ।

এমনকি, শিল্পীর নিগূঢ় সৃষ্টি শক্তিকেও তিনি যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতে পারেননি। আমাদের বর্তমান সময়ের চিহ্ন আছে তাঁর এই মননে। পরিশেষে এক কাল থেকে অন্য কালে এগিয়ে যাবার আশা ফুটেছে তাঁর রচনায়।

শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে!

(—হাওয়ায় যেমন)

তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যপ্রবাহ থেকে এসব কথা যাঁরা আলাদা করে তুলে দেখবেন তাঁদের চোখে পনেরো-বিশ বছর অথবা তারও আগেকার চিন্তা-চেষ্টাময়, প্রদর্শন-প্রয়াসী বিষ্ণু দে-ই হয়তো অপরিবর্তন এক স্বভাবের প্রতীক হিসেবে পুনরায় প্রতিভাত হবেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে না দেখলে তাঁর একালের আসল পরিচয় সম্বন্ধে সংশয় দূর হবে না। বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে, দুজনেরই পঞ্চাশ বছর বয়স হল। এ বয়সে ভাবুকের মন অন্তর্মুখী না হয়ে পারে না। সে অন্তর্মুখিতার চিহ্ন আছে আলোচ্য দুটি বইয়েতেই। বিষ্ণুবাবুর 'সনেট', 'স্মৃতির গোধূলি', 'বহুরূপী', 'এক যুগের সংলাপ',—বুদ্ধদেববাবুর 'শিল্পীর উত্তর', 'কবি : তরুণ ও প্রৌঢ়', 'পঞ্চাশের প্রান্তে' প্রভৃতি তারই নমুনা। তফাত এই যে, বিষ্ণু দে যত নিবিড়, বুদ্ধদেব তাঁর এ-বইয়ে ততটা নন। বরং শীতের প্রার্থনা আরো স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছিল। সেখানকার কুকুরের প্রতীকও বিষয়গুণে সার্থক ছিল। তাঁর যাত্রী-মনের বিষাদ, প্রশান্তি, জিজ্ঞাসা ফুরোয়নি বটে, কিন্তু আবার বেশ জোর করে নেমেছে আঙ্গিকের আড়ম্বর, প্রযুক্তির ঘষা-মাজা। হয়তো সেই কারণেই "যে আঁধার আলোর অধিক"—এতে আলোর চেয়ে অন্ধকার কিছু বেশি মনে হয়। তবে এও ঠিক যে, সে অন্ধকারের সবটাই মেকি নয়। তাতে আত্মচিন্তাময় কবিরও কাজ আছে এবং সেই সঙ্গে আত্মবিস্মৃতিময় ভঙ্গিরও উৎপাত ঘটেছে। প্রাচীন কাব্য-পুরাণের দিকে উভয়েই উন্মুখ। বিষ্ণু দে আগেও তাই ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সে ঝোঁক আগে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, আজকাল বেড়েছে। 'জন্মাষ্টমী—১৩৫৪'-তে বিষ্ণু দে পর-পর কপিলগুহা, নচিকেতা,

ত্রিশঙ্কু, চিত্রগুপ্ত, ভীষ্ম, ভগীরথ ও জহ্নুমুনির নাম করেছেন। অন্যান্য অনেক লেখাতেই অনুরূপ লক্ষণ আছে। বুদ্ধদেব বসু-র কচ-দেবযানী প্রসঙ্গ সেদিক থেকে একসূত্রে স্মরণীয়। কিন্তু মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের পরে তৎপ্রসঙ্গে তিনটি রচনার পরম্পরাবয় পরিবেশন করেও বুদ্ধদেব পূর্বগামীদের এতৎপ্রাসঙ্গিক সিদ্ধির বহু যোজন দূরে থেকে গেছেন। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে এসে কচ-দেবযানীর সুদূর ও চিরন্তন হৃদয়বেদনার 'ক্ল্যাসিক' মূর্তিটাই মন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ভাষার গাম্ভীর্য ভেঙে দেওয়াটা সব ক্ষেত্রে সঙ্গতও নয়, সাধ্যও নয়—এই সূত্রে সেই কথাটাই বিশেষভাবে মনে পড়ে।

মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
তোমার পরে নাস্তি শুধু
রইলো আরাধনা।

—বিচ্ছিন্নভাবে এ ভাষার অথবা এ সুরের যে স্বাদই থাক, 'দেবযানীর স্মরণে কচ', এই শিরোনামের ইশারা মনে রাখলে অভিপ্রেত বোধও পীড়িত হয়, বাঞ্ছিত বেদনাতেও পৌঁছোনো সম্ভব হয় না। তবে, এ-সব কথা অনুরাগী মনের সহজ বিনয়সহকারে প্রকাশ করা গেল। বলতে গিয়ে ভয় হয়, ভুল বোঝবার সম্ভাবনা রয়ে গেল বুঝি! তাই সংক্ষেপে পুনরায় বলা যেতে পারে যে, 'মণি, আমার মণি, আমার সোনা'—এই উচ্ছ্বাসটা কেমন যেন হালকা মনে হয়। কচকে এতকাল পরে হালকা হতে দেওয়া একরকম নতুনত্ব বটে, কিন্তু সব নতুনত্বই কি আদর্শ? কচ-দেবযানী প্রসঙ্গ ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর এ বইয়ে 'অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা' নামে একটি কবিতা আছে। তাতেও পুরাণ বা প্রাচীন কাব্যের প্রতি আগ্রহের যথেষ্ট গ্রাহ্য কারণ নেই। তবে, সেরকম নিমিত্তাবয় ব্যতিরেকেও সেটি সুখপাঠ্য। তেমনি এ বইয়ের 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' আর নবম প্রণয়ের ওপরে লেখা দুটি কবিতা। 'স্মৃতির প্রতি' শিরোনামে, 'রাত তিনটের সনেট' পর্যায়ে এবং 'না-লেখা কবিতার প্রতি', 'আটচল্লিশের শীতের জন্য', 'প্রেমিকের জন্য'—এ-সব প্রসঙ্গেও তিনি পর্যায়ক্রমিক একাধিক কবিতা লিখেছেন। হয়তো একই বিষয়ে একাধিক লেখা আপনিই এসেছে। বইয়ের মধ্যে পর্যায়বন্ধের ঝোঁকটা হয়তো সত্যিই আপাতিক ব্যাপার। তবু এ-কথাও মনে জাগতে পারে যে, বাংলা কবিতায় এ বোধ হয় আর-এক কৌশলের খেলা! বিষ্ণু দে-র 'একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা'ও একই আঙ্গিকের নমুনা। তাঁর 'জন-তিনেক ভগ্নহৃদয়', বইয়ের নাম-কবিতা 'আলেখ্য', 'রাগমালা' ইত্যাদিতেও প্রসঙ্গগত ঐক্য বজায় রেখে একাধিক রচনা-সংযোগের খেয়াল ধরা দিয়েছে। একই কালের এক বা একাধিক কবি যখন একই খেয়ালের বশবর্তী হন, তখনই কবিতার এক-একটা বিশেষ অভ্যাস বা মুদ্রাদোষের জন্ম হয়। লক্ষণটি সেদিক থেকেও উল্লেখ দাবি করে। আর, লাইন সাজানোর খেয়ালে বুদ্ধদেব বিবিধ কৌশলময়। একটি পুরো কবিতা তুলেই দেখা যাক—

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ : এই দেহ ম্রিয়মাণ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুনে ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ



ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দ্রুত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

চোদ্দ লাইনের বিন্যাসে প্রথমে চার-চার লাইনের গুচ্ছে বাঁধা হয়েছে; শেষে তিন-তিন লাইনের আর-দুটি গুচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখানে। অন্ত্য-মিলের দিকে নজর দিলে প্রথম দুটি গুচ্ছে দেখা যায় কখ খক এবং গঘ ঘগ—বিন্যাস; আর, শেষ দুটির অন্ত্যস্বভাবটা মিশ্র হলেও চ চ ঝ ট ঝ ট—সমাবেশ চোখে পড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কবির মনে ভাবনার স্রোত বা ঢেউ বা আলো বা অন্ধকার কি ঠিক এই ধরনের লাইনবন্দী চেহারার জন্যে উন্মুখ ছিল? যদি লেখা যায়—

আমাদের পরিবর্তনের অর্থ—
এই দেহ ম্রিয়মাণ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান।
তাও শুধু—
পিতৃহননের নান্দীপাঠে ফাল্গুনে ফুরায়।

—তাহলে এ কবিতার প্রথম পাঁচলাইনের যা বক্তব্য, তার কি কোনোরকম হানি হয়? মিল, লাইন, স্তবক সবই অশেষ চেষ্টায় বানানো, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কনফুশিয়াসের সেই তীরন্দাজ কি অতঃপর আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্যোগী না হতেন?

বিষ্ণু দে-ও কায়দা দেখান বটে কিন্তু "আলেখ্য" বইখানির মধ্যে উগ্র কোনোরকম কলাপ্রদর্শনী নেই। বরং বুদ্ধদেবের 'মরুপথ'-এর শেষ দু-লাইনে এসে পাঠককে ভাবতেই হয় যে, একজনের স্বভাব অন্যজনের মধ্যে বর্তালো নাকি? মরুভূমির খরতাপে পুড়ে-পুড়ে লোকটা শেষে যখন একটু জলের হদিস পেয়েছে, এবং—

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, আঙুল পাগল হয়ে খুঁড়ে তোলে জল :
তখন—
অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর বীজাণু ছড়িয়ে দেয়;
সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফলে ওঠে ফল;

সাধারণ বাঙালী মরুভূমি, মরীচিকা, উট, বালি, উত্তাপ, মরুদ্যান ইত্যাদি মরুপ্রসঙ্গের অনেক খবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল; কিন্তু 'কনুইয়ের লোমকূপে ফলে ওঠে ফল'—ব্যাপারটা তাঁদের কাছে যদি দুর্ভেদ্য মনে হয়, তাহলে সে কি তাঁদেরই মূঢ়তা মনে করতে হবে—না-কি কনফুশিয়াসের সেই তীরন্দাজের গল্পটি কবির পক্ষে সেক্ষেত্রে পুনরায় স্মরণীয়? কবিতার সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে এই বইয়েরই 'মিল ও ছন্দ' লেখাটার মধ্যে বুদ্ধদেব নিজে বলেছেন—

অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে দূর
কিছুই বলে না, শুধু ভেদ করে বেজে ওঠে সুর—
সুর নয়, শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে বাজায়

দেবতা, নির্জ্ঞান মন, নাকি এক চতুর শয়তান?

মনস্তত্ত্বের কথা মনস্তাত্ত্বিক ভাবুন। কবির আত্মবিশ্লেষণের মর্জিতেই বা আপত্তি হবে কেন? কিন্তু তর্ক, তত্ত্বজ্ঞান, গুরুপাণ্ডিত্য,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস,—কবিতার বৃহৎ আশ্রয়ে এদের প্রত্যেকেরই যদিও জায়গা হওয়া অসম্ভব নয়, তবু এদের পৃথক-পৃথক অথবা সমাহারময় তাত্মাত্রিকতার নাম কবিতা নয়।

পাঠকের পক্ষে এর বেশি নিবেদন নেই। "যে আঁধার আলোর অধিক"—এর সামগ্রিক আবেদনের কথাসূত্রে শুধু এইটুকু মনে আসছে যে, কবি তাঁর পূর্বকথাই এতে পুনরায় প্রকাশ করেছেন। বইয়ের নাম দেখে 'আলো'-র প্রত্যাশী ছিলাম কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিষাদ-বোধ, নৈরাশ্য এবং তর্কবিতর্ক এতে আর-একবার দেখা গেল। বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছেন—

হতে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল!

অর্থাৎ কবির চেতনায় দুঃখের কাঁটা বিঁধে আছে। সে দুঃখ থেকে সত্যিকার বড়ো সৃষ্টি কি সম্ভব হবে?

অপরপক্ষে বিষ্ণু দে শুধু 'সহজ'-ই হননি—তিনি নতুন উৎসাহে আরো যেন 'সুখী' হয়েছেন। বুদ্ধদেব যেমন তাঁর একটি কবিতায় গভীর রাত্রির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে লোকে যাকে 'রাত' বলে, তা নয়,—নক্ত, যামিনী, নিশীথিনী, রজনী ইত্যাদি অনেক শব্দের মধ্যে কবিমনের সেই গভীর অভিজ্ঞতার 'রাত' ছড়িয়ে আছে,—বিষ্ণু দে-র "আলেখ্য" পড়তে পড়তে তেমনি তাঁর সম্বন্ধে 'সুখী' কথাটাই প্রথমে মনে এল। আরো ভেবে দেখলে ও-কথা বদলে দিয়ে হয়তো অন্য কিছু বলবার ইচ্ছে হবে। হয়তো, তাঁর প্রৌঢ় পরিণত মনের এ-এক পূর্ণতার আভাস! হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অভ্যাস থেকে শান্ত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অভীপ্সিতার একাত্মতা তাঁর বোধে এল। কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের থেকে এ মর্জির ব্যবধান যৎসামান্য। তবু, একে নতুন বলতেও বাধা নেই!

বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর -এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি? কর্মরত, দৃঢ়বন্ধনীবি
যেখানেই থাকো তুমি, বৃষ্টি নামে, মেঘে মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা
অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের খাড়াই উৎরাই
ঢাকি একই আলিঙ্গনে বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাকো বাষ্পে বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা!
(—বৃষ্টি চলে, বৃষ্টি অবিরাম)

অবশ্য জীবনের আরো নানা দিক আছে। প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যও তিনি এ-কালের চোখ দিয়েই দেখেছেন। সে সৌন্দর্যের নাম 'বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরাম'। কথাটা তাঁর উপলব্ধিরই



ইশারা। তাঁর এইসব কবিতার বিশেষ-বিশেষ শিরোনামে, এবং অনেক লাইনের মধ্যেও সত্যিকার সংহতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। 'শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে',—'শান্তি নেই জীবনের এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে' এবং এই ধরনের আরো কোনো-কোনো উক্তির মধ্যে সংযতবাক্, সুরসিক, মগ্ন অথচ সজাগস্বভাব যে-কবিকে বেদনা প্রকাশ করতে শোনা গেল, তিনি হতাশ নন, বিষণ্ণ নন, ব্যঙ্গমুখর নন। তাঁকে আমাদের সম্বন্ধে সমবেদনাময়, একজন আধুনিক, শক্তিমান এবং সুখী কবি বলেই চেনা গেল।*

**হরপ্রসাদ মিত্র**

* যে-আঁধার আলোর অধিক—বুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ২·৫০
আলেখ্য—বিষ্ণু দে। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ২·৫০

## স মা লো চ না

---

Inside Russia To-day. *By* John Gunther. Hamish Hamilton. London. 25*s*.

শোনা যায় পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী বই লেখা হয়েছে প্রধান চারটি ধর্ম সম্পর্কে। তারপরই বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়া আর কম্যুনিজম নিয়ে লেখা বইপত্রের স্থান। গত ত্রিশ বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যাবে রাশিয়া আর কম্যুনিজম সম্পর্কিত বইপত্রের সংখ্যা ধর্মগ্রন্থের বিপুল পরিধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। দুয়েরই আকর্ষণ সম-গোত্রীয় বলা অযৌক্তিক হবে না; অন্তত টয়নবী প্রমুখ অনেক বিশ্বতাত্ত্বিক ইতিহাসশাস্ত্রী বলছেন, আজকের পৃথিবীর ভাবসন্ধের একপ্রান্তে সর্বাত্মক সেক্যুলার রাজনৈতিক ধর্ম, কম্যুনিজম—যার পীঠস্থান সোভিয়েট রাশিয়া; আর একপ্রান্তে হল বনেদী আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি। বন্ধুভাবে হোক কিম্বা বৈরীভাবে হোক সোভিয়েট রাশিয়ার "টান" না মেনে উপায় নেই। একদা ফরাসী বিপ্লবের "টান" য়ুরোপকে অস্থির করেছিল। ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবের ধাক্কা এখনও ইতিহাসের অতীতকালের খাতায় হিসাব ভুক্ত করা যাচ্ছে না। ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী প্রভাব সক্রিয় ছিল ১৭৮৯ থেকে বড় জোর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। তারপর যা রইল সে হল ঐতিহ্য, যাকে ভদ্রদস্তুর ভাবে ঘরে রাখলে কোনো হাঙ্গামার ভয় নেই। চল্লিশ বছরেও সোভিয়েট রাশিয়া, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ড ইত্যাদি এরকম মোলায়েম ঘর-সাজান রূপ নিতে পারেনি বা নেয়নি। তা নেয়নি বলেই রাশিয়া সম্পর্কে এত প্রশ্ন, এত সংশয়, এত আশা নিরাশা, ঘৃণা, ভয়, ভক্তি এবং প্রীতির হতবুদ্ধিকর সমাবেশ। এ দেশ কেমন, এখানকার মানুষরা কী ভাবে দিন কাটায় এদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মের রীতিনীতি কী ধরনের, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে কী এদের ধারণা, এবং উদ্দেশ্যই বা কী—হাজার রকমের এমন সব প্রশ্ন অনেকের মনে ভীড় করে আছে। এসব প্রশ্নের উত্তরও হাজার রকমের; কোনটা ঠিক তা নির্ধারণ করবার উপায় আমাদের হাতের কাছে নেই। একই লেখককে (যেমন এডওয়ার্ড ক্র্যাঙ্কশ) দেখেছি মাত্র দু-তিন বৎসরের ব্যবধানে রাশিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উল্টোপাল্টা বর্ণনা দিচ্ছেন—প্রথমে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারপর বৎসর ঘুরতেই রাশিয়ার চরিত্র, মতিগতি সব কিছুর মুণ্ডপাত। "সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা ও বিচার পদ্ধতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগে ও পরে"—এই ধরনের চমৎকার একটা তুলনামূলক গবেষণা করা যেতে পারে। দুটি শুধু বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নয়। "সোভিয়েট রাশিয়া একটা প্রহেলিকা এবং সেটাও আবার ধাঁধায় জড়ানো" চার্চিলের এই বিখ্যাত উক্তি যোল আনাই বিস্ময়-প্রসূত নয়। অথবা অগ্নি আর একটি উক্তি—সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কেউ-ই বিশেষজ্ঞ নন অর্থাৎ কারোই বিশেষ জ্ঞান নেই, যা আছে সে হল আপেক্ষিক অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা—কারো কম, কারো বেশি। শুধু আপেক্ষিক অজ্ঞতা নয়, এর উপর আছে রাশিয়ার প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ অথবা অন্ধ ভক্তির যুক্তিহীন বাড়াবাড়ি। আর আছে সোভিয়েট রাশিয়ার কর্তাব্যক্তিদের প্রচণ্ড সন্দেহ প্রবণতা। এর কারণ





কতকটা ঐতিহাসিক, কতকটা ভাবনৈতিক। চার্চিল যে যুগে বলশেভিক রাশিয়াকে তার আঁতুড় ঘরে টুঁটি চেপে মারবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন সে যুগের স্মৃতি সোভিয়েট নেতারা ভুলে যেতে পারেননি এবং সেজন্য তাঁদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। সে যা হোক, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে পারেনি,—আগেও নয় এখনও নয়; রাশিয়ার অনেক কিছুই তাই বাইরের লোকের পক্ষে জানা এবং বোঝার সুযোগ সহজ লভ্য নয়। কেবল বাইরের কেন, রাশিয়ার ভিতরের লোকেরাও তাদের রাষ্ট্রনীতির অনেক আকস্মিক নাটকীয় পরিবর্তনের রহস্য বুঝতে পারে না বলেই মনে হয়। ক্রেমলিনের সাজঘরে কখন কোন উদ্যোগী পুরুষ নূতন ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে দেখা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তা রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের চাইতে বেশি জানতে পারে বলে মনে হয় না। এতো গেল রাজনীতির কথা। সাধারণ বিষয়েও সন্দেহপরতা এবং গোপনীয়তার দৃষ্টান্ত অজস্র। মস্কোয় টেলিফোন থাকলেও, টেলিফোন ডাইরেক্টরী সাধারণের হাতে পড়ে না, গাণ্ধার এই উদাহরণটির উল্লেখ করে কিছু সরস মন্তব্য করেছেন। টেলিফোন ডাইরেক্টরী কেন দুর্লভ জিনিস তার স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক রকম যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। মুস্কিল এই যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে না এই রকম ছোটো বড়ো অনেক বিষয়ে। আর সেই জন্যই রাশিয়া সম্পর্কে অনেক বইপত্র পড়েও অনেক কিছুই জানা এবং বোঝা সম্ভব নয়, এই অস্বস্তিকর ধারণা মনে দৃঢ়মূল হয়ে থাকে।

নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না; কারণ আমরা ভারতের বুদ্ধিজীবীরা অন্তত বলশেভিক রাশিয়ার বিপুল সংকল্প এবং প্রয়াসকে যতদূর সম্ভব খোলা মনে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছি প্রথম থেকেই। এই শতাব্দীর শুরুতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থীরা নানা দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে থাকেন। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে অগ্রণী বাঙালী তরুণ মহলের নিত্যকার পাঠ ছিল আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে "জারের" রাশিয়ায় নির্হিলিস্টদের দুঃসাহসিক বীরত্ব-কাহিনী। তারপর এল ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব। এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সহজ হয়নি; এর যুগান্তকারী ভাব-নৈতিক তাৎপর্য অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল এবং যখন ক্রমে ক্রমে জানা সম্ভব হল তখন সোভিয়েট সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার অনেক কিছু আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ১৯২২-২৫ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "ভ্যানগার্ড" পত্রিকা এবং বলশেভিক রাশিয়া সম্পর্কিত কিছু কিছু বইপত্র এদেশে নানা চোরা পথ ধরে আসতে থাকে। সেই সময় থেকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মনে রাশিয়া সম্বন্ধে কৌতূহল জাগতে থাকে। বিস্ময় এবং সংশয়-মেশান আগ্রহ। মনে পড়ে, প্রথম যে বই রাশিয়া সম্পর্কে চমক লাগায় সে হল মার্কিন লেখন জন রীডের "টেন ডেজ দ্যাট্ শুক্ দী ওয়র্ল্ড"। তারপর রাঁস্ উইলিয়ম্সের "দ্রু দী রাশ্যান রেভল্যুশন"। এরপর প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটতে এলেন রেনে ফুলপ মিলার ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল। ত্রিশ দশকের শুরুতে এই পর্যন্ত; তবে নেহেরুর (এবং রবীন্দ্রনাথের) রাশিয়া ভ্রমণ কাহিনী এবং বলশেভিক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি অনেকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার সংকল্প সাধনের ইতিহাসে অজস্র অনাচার অত্যাচারের স্পষ্ট নিদর্শন পেয়েও বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক আনুগত্য যেন কিছুতেই বিচলিত হয়নি—যাকে সোভিয়েট "মিস্টিক" বলা হয় তার এমন প্রচণ্ড বিশ্বাস-সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল

ত্রিশ দশকের শেষ পর্যন্ত।

এই সময়ের মধ্যে বলশেভিক রাশিয়া অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে, যদিও স্টালিন-ট্রট্স্কী বিবাদের ঝড়-ঝাপটার ধাক্কায় অনেকের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি টাল সামলাতে হয়রান হয়েছে। ত্রিশ দশকের শুরুতে ধনতান্ত্রিক জগতে প্রচণ্ড অর্থসংকটের ফলে নতুন করে সামাজিক মূল্যায়নের তাগিদ প্রবল হল বুদ্ধিজীবী মহলে। এই সময়টাকে ভাবনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট প্রভাবের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন মানবধর্মী সভ্যতা বলে প্রশস্তি জানালেন সিড্নী ও বিয়াত্রিস্‌ওয়েব্, বার্নাড শ', রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মনীষীরা। ১৯১৭-২৯ সাল পর্যন্ত ছিল সোভিয়েট সম্পর্কে সংশয়, ভয়, অবজ্ঞা এবং ঘৃণা প্রবলভাবে উচ্চারিত। দ্বিতীয় পর্বে (১৯২৯-১৯৩৯) ধনতন্ত্রের প্রতি বিরাগ সুস্পষ্ট এবং ফ্যাসিবাদের উদ্ভব শঙ্কাদায়ক হল; তেমনি সোভিয়েট সামাজিক সংকল্পের প্রতি আস্থা এবং সমর্থন হু-হু করে বেড়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তো প্রায় সব গণতন্ত্রী দেশই সরকারীভাবে সোভিয়েট শক্তিমত্তার প্রশংসায় নিযুক্ত হল। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ঠাণ্ডা যুদ্ধের শুরু পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মনোভাব ছিল প্রধানত অনুকূল এবং বন্ধুভাবাপন্ন। "ফেলো ট্রাভলার" বলে পরিচিত হওয়া আজকের দিনে অসুবিধাজনক, মর্যাদাহানিকর হয়েছে বটে; কিন্তু এককালে অর্থাৎ ১৯২৯-১৯৩৯ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশ "ফেলো ট্রাভলার" বলে পরিচিত হতে দ্বিধাবোধ করেনি। আজকের রাশিয়া তার বিপুল শক্তিমত্তা এবং নানাক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর কাছে একটা কঠিন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর জন্য সবটা দায়িত্ব অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার নয়। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অন্ধ আসক্তির মোহভঙ্গের প্রয়োজন ছিল; রাশিয়ার বিরোধী শক্তিরা সেই মোহভঙ্গের কাজে উৎসাহী যদি নাও হত, তবু স্বাভাবিক নিয়মে একদিন না একদিন সোভিয়েট গাণ্ডীবের ছিলায় ঢিল পড়ত-ই। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত আতিশয্য এবং ব্যভিচার "য়্যান্টি জেকবিন" (Anti-Jacobin) প্রচার-কর্মের মালমশলা যুগিয়েছিল বটে; কিন্তু বিপ্লবের পট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল ফ্রান্সের ভেতরের লোকেরাই নিজেদের তাগিদে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের শুরুতে কোন রহস্যময় কারণে আর্থার কেশলার এবং জর্জ অরওয়েল সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্ধকারময় দিক উদ্ঘাটনে উৎসাহিত হয়েছিলেন তা নির্ণয় না করলে ক্ষতি নেই। একথা ঠিক যে, সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার অনেক মারাত্মক দোষ ত্রুটির যথার্থ এবং কাল্পনিক কাহিনী প্রচারের ঢালাও বন্দোবস্ত করেছেন ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরমপন্থী-নায়কেরা। কিন্তু আগে যা বলেছি, এঁরা তা না করলেও সোভিয়েটের অন্তর্বিরোধই তার স্বরূপ স্বাভাবিক নিয়মে প্রকাশ করত। তা করেছে এবং এখনও করছে, খ্রুশ্চেভের বিখ্যাত নাটকীয় বিবৃতির পর সে সম্বন্ধে সংশয় থাকতে পারে না।

সোভিয়েট দেশটা স্বর্গও নয়, নরকও নয়, এই সাধারণ সত্যটি মেনে নিতে পারলে অনেক মোহান্ধতা, অনেক অন্ধ অনুরাগ এবং বিরাগের অসুস্থ উত্তেজনা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। জন গান্থার সে কাজে সহায়তা করেছেন। গান্থারের দেখা "আজকের রাশিয়ার" অন্তস্থল হয়তো আর **আজকের** নেই, গতকালের কিম্বা পরশুর। হয়তো গান্থার রাশিয়ার অন্তঃস্থলেও পৌঁছুতে পারেননি; কে-ই বা কোনো দেশের অন্তঃস্থলে পৌঁছুতে পারে? সে কথা যাক, তবে গান্থার পাঁচ শো পৃষ্ঠায় "আজকের রাশিয়ার" অভ্যন্তরের



ছবির পর ছবি এঁকে যে গ্যালারী সাজিয়েছেন তার একটি বড়ো আকর্ষণ হল বর্ণনার মনোহারিণী সাবলীলতা। গান্থারের সব কয়খানি "ইন্‌সাইড" কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে বিশ্বপরিক্রমা করলে ক্লান্তি বোধ করা যায় না। সজাগ চোখ এবং কান, দরাজ মন আর টাইপ রাইটার এবং এরোপ্লেনের সঙ্গে সমান পাল্লার দৌড়ে অদ্বিতীয় গান্থারকে আমাদের কালের "মার্কো পোলো" বললে অত্যুক্তি হবে না। গান্থারের বর্ণনা পদ্ধতি অদ্ভুত, অননুকরণীয়। ছোট বড়ো নানা জিনিসের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু অতীত ইতিহাসের মালমশলা ঢুকিয়ে দেন, কোনোরকম পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর না করে। রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের খুঁটিনাটি তুলনাগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। মার্ক্সবাদের প্রতি গান্থারের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? তিনি একটা দেশকে তাঁর সাধ্যমত জানতে এবং অন্য জিজ্ঞাসুদের জানাতে চেষ্টা করেছেন। তত্ত্ব প্রতিপাদন তাঁর উদ্দেশ্য নয়; অনেক তর্কও তিনি আলগোছে ছুঁয়ে এড়িয়ে গেছেন। গান্থারের গড়া সোভিয়েট চিত্র-প্রদর্শনী পূর্ণাঙ্গ না হলেও জীবন্ত, এর কোনোখানে হঠাৎ কালি ছেটানো হয়নি, চড়া রং লেপা হয়নি। রাশিয়ার অন্তঃস্থলের না হোক, রাশিয়ার অভ্যন্তরের অনেক কিছু ভালো এবং মন্দ গান্থার দেখেছেন এবং সেগুলি নিপুণ হাতে সাজিয়ে যে নির্ভরযোগ্য আবহ রচনা করেছেন তাতে সোভিয়েট রাশিয়ার জটিল জীবনধারার ইতিহাসাশ্রিত এবং সমসাময়িক দুটি দিকই বুঝতে সাহায্য করে। গান্থারের চোখে-দেখা রাশিয়া ভয়াবহ বর্বরতার লীলাভূমি নয়; সোভিয়েট বিজ্ঞান ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্বন্ধে গান্থারের বিবরণ পড়লে অনুভব করা যাবে যে, রাষ্ট্রিক এবং ভাবনৈতিক নানা বিষয়ে অন্য দেশের সঙ্গে মূলগত ব্যবধান থাকলেও জন-কল্যাণের সর্বজনীন মানবিক আদর্শে রাশিয়া এবং অন্যসব দেশ একসূত্রে বাঁধা। রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ এবং ব্যবধানই অমোঘ সত্য নয়; সভ্যতা ও শান্তির প্রয়োজনে বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব সম্ভব এবং রাশিয়া সে বিষয়ে যথার্থই আগ্রহী, এ কথাটি গান্থার বার বার নানাভাবে বহু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। গান্থারের বই পড়ে সোভিয়েট-প্রীতি না বাড়লে ক্ষতি নেই; অন্তত সোভিয়েট-ভীতি এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের উত্তেজনা কমবার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান গান্থার রাশিয়ার অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন।

**সরোজ আচার্য**

The Political Economy of Growth. *By* Paul A. Baran. Monthly Review Inc. New York. $5.00.

ডীন জনসনের মতো, অধ্যাপক পল বারানের সংস্থানও বিস্ময়দ্যোতক। গত দশ-বারো বছরের রাজনৈতিক ঝড়ঝাপ্টা তাঁকে আধ্যায়নিক তপ্গতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভবত তিনিই একমাত্র মনীষী মার্ক্সীয় পরিপন্থায় আস্থা সত্ত্বেও যাঁকে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবহারিক ক্ষতি সইতে হয়নি। যেখানে পল সুইজী পর্যন্ত হার্ভার্ডের উদারচরিতমণ্ডলী থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন, সে-অবস্থায় অধ্যাপক বারান কোন মন্ত্রবলে একটি অভিজাত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতচিত্ত হৃদয়ে বহাল হয়ে আছেন

তা নিশ্চয়ই একটি ছোটোখাটো গবেষণার বিষয় হতে পারে। তিনি শুধু যে স্বীয় জীবিকা কোনোক্রমে অটুট রেখে গেছেন তাই নয়, মার্ক্সীয় চিন্তার শাখা-প্রশাখায় উন্মুক্ত নিকুণ্ঠায় ভাবনা-অনুভাবনাদের বিস্তার করতে সফল হয়েছেন পর্যন্ত, তার প্রমাণ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ *The Political Economy of Growth.*

গ্রন্থের নামকরণ লক্ষ্যণীয়। ধনবিজ্ঞান এক-দশকের পরিসরে নতুন অভিধা শিখেছে। ডোমার-হ্যারডের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ইতস্তত-চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলীতে সামগ্রিক সংস্থার প্রগতি নিয়ে যে-আলোচনার শুরু, তা এখন প্লাবনের তীব্রতায় অন্য-সমস্ত বিষয় ও সমস্যাদিকে পুরোপুরি ভাসিয়ে নেওয়ার উপক্রম করেছে। নানা খুচরো আলোচনা-বিতর্কের কথা ছেড়ে দিলেও, গত তিন-চার বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রগতির কাঠামো ব্যাখ্যা করে অন্তত দুটো উল্লেখযোগ্য বই গত তিন-চার বছরের মধ্যে পেয়েছি : আর্থার ল্যুইসের *Theory of Economic Growth* ও শ্রীমতী রবিনসনের *Accumulation of Capital.* এই বই-দুটোর অন্তর্বর্তী চরিত্রগত পার্থক্য অবশ্য যথেষ্ট : ল্যুইস অর্থনৈতিক প্রগতিকে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মচর্চা, আচারকলা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক অনুভূমিকার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন; নিছক ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা সামান্য, তাঁর চিন্তার বিস্তারে পরিসঙ্গই প্রধান। অন্যপক্ষে, শ্রীমতী রবিনসন প্রগতির প্রক্রিয়া-প্রণালী নিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন এবং সেজন্যই বিনিয়োগের সর্বমুখী সমস্যাই তাঁর গ্রন্থে প্রধান ব্যাপ্তি পেয়েছে।

বারানের প্রব্রজ্যা আরেক অন্বিষ্টে, প্রগতির *political economy* বিশ্লেষণ তাঁর প্রায় একমাত্র লক্ষ্য। এ ধরনের আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজনপূর্ণ। ল্যুইসের সর্বাচ্ছাদনী নামাবলী থেকে কী-করে যেন রাজনীতি বাদ পড়ে গেছে, অর্থনৈতিক প্রগতির বিবর্তনে রাজনীতির অঙ্গুলিহেলনের ঈষদাভাস পর্যন্ত অনুপস্থিত। শ্রীমতী রবিনসন শুধুমাত্র বিনিয়োগের ব্যাকরণ বিশ্লেষণেই আগ্রহ দেখিয়েছেন সুতরাং তাঁর বইতে রাজনৈতিক সমস্যা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। অথচ ভেবে দেখলে ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক সোপানে রাজনীতির অভিভাব এবং প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা মোটেই অবরুদ্ধ থাকেনি : এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর অর্থনৈতিক সূত্রগঠনে রাজনীতির ফিসফাস কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া সম্ভব, মার্ক্সের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম।

অতএব বারানের বিষয় নির্বাচনে যুক্তির অভাব নেই। বলা বাহুল্য, তাঁর আলোচনার কাঠামো মার্ক্সীয় সংস্থানে দাঁড় করানো। ব্যক্তিগত প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও, এই পছন্দের অন্যদিক থেকেও সমর্থন সম্ভব। আজ পর্যন্ত একমাত্র মার্ক্সীয় অভিধানেই অর্থনৈতিক বিবর্তনের রাজনীতিগত ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্য-কোনো চিন্তার অনুশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা প্রায় অনারব্ধ। তাই মনে হয় যদি কেউ ঠিক এদিক থেকে প্রগতির মর্ম-বিশ্লেষণে এগোন, তাঁকে মার্ক্স থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে : হয় মার্ক্সকে খণ্ডন করে এগোতে-এগোতে নতুন দিঙ্‌নির্দেশ মিলবে, নয়তো মার্ক্সীয় সত্তার চারপাশে নতুন স্থাপত্য যোগ করতে-করতে।

বারানের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে নানামহল থেকে যে আপত্তি হয়তো উঠবে তার কারণ এই জন্য যে অনেকেরই মনে হবে নতুন তথ্য জড়ো করা হয়েছে যদিও প্রচুর, মার্ক্সকে ছাড়িয়ে তেমন-কোনো চিন্তার যোজনা নেই সারা বইতে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই বড়ো-বেশি প্রথাগত, যেন বহুবার-পঠিত বস্তু আরেকবার পরিবেশন করা হচ্ছে, মাত্র অন্য বাসনে গরম করে।



ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পাম দত্ত যা লিখেছেন, বারান তাই কি আরো-একটু বিস্তৃত করে সাধারণ তত্ত্বে দাঁড় করিয়ে বলছেন না?

অথচ তাঁর বলবার ভঙ্গি এবং আলোচনা-সাজানোর বিন্যাস, চিত্তগ্রাহী। প্রথমেই প্রগতির সমস্যার চমৎকার বিবরণ, তারপর Surplus—যা প্রগতির কেন্দ্রশক্তি—তার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা। এই অধ্যায়টি শ্রীমতী রবিনসনের বইয়ের মুখবন্ধ হিসেবে জুড়ে দিলে আমার বিবেচনায় নিখুঁত যোটক হয়, বারানের বিশ্লেষণ এতই প্রাসঙ্গিক এবং পরিপূরক। পরবর্তী আলোচনা প্রায় ছক-কাটা। দুটো পরিচ্ছেদ Standstill and Movement under Monopoly Capitalism-এর উপর ব্যয়িত হয়েছে। চর্বিতচর্বণের প্রাচুর্য এখানে একটু বেশি। পরের অধ্যায় On the roots of Backwardness: শিল্পাগ্রসর দেশগুলির প্রসঙ্গ পেরিয়ে এখানে আলোচনা দরিদ্রতর ও দরিদ্রতম দেশগুলির সমস্যায় পৌঁচেছে। এ সমস্ত দেশের—এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা, এমন কি দক্ষিণ ইউরোপের 'অনুন্নত' রাজ্যগুলি পর্যন্ত বারানের দৃষ্টির বাইরে নয়—অর্থনৈতিক দৈন্যের পরিচিত কারণগুলি একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করা হয়েছে এ-অধ্যায়ে এবং সেই সূত্রে পরের দুই পরিচ্ছেদে বারান একটি Morphology of Backwardness এর খসড়া প্রস্তাব করেছেন। সবশেষে The Steep Ascent, এখানেও অবশ্য সমাধান হিসেবে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষই ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সে-ঘোষণায় প্রচলিত যুক্তিপ্রচয়ের বাইরে পরিভ্রমণ নেই।

তাই সব-মিলিয়ে গ্রন্থটি পাঠ করে একটু হতাশার ভাব থেকেই যায়। মনে হয় *The Political Economy of Growth*-এর প্রধান মূল্য নির্ণয় করবে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি, তত্ত্ব নয়। বিশেষত লাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলিতে মার্কিন শোষণের যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই বইতে জড়ো করা হয়েছে, তা অন্য-কোথাও পাওয়া ভার। এবং সে-কারণে প্রথম বিস্ময়েই ফিরে আসি : প্রতিক্রিয়ার শ্বাসরোধী আবহাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন দেশে বসেই যে অধ্যাপক বারান এ-গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছেন, তজ্জন্য তাঁকে যেমন ধন্যবাদ, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেই সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, নামে যে-উত্তেজক আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি, গ্রন্থটির পঠনে তার ভগ্নাংশিক স্বাদও নেই। এই বিষয় নিয়ে উৎকৃষ্টতর বই লেখবার সুযোগ তাই এখনো অব্যাহত।

**অশোক মিত্র**

Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Culture. *Edited By* Ernest Manheim and Paul Kecskemeti. Routledge and Kegan Paul. London. 28*s*.

আধুনিক সমাজবিদ্যার জগতে কার্ল ম্যানহাইম যে কতটা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, এবিষয়ে সামান্য কৌতূহলী যাঁরা তাঁদের তা অজানা নেই। কয়েক বছর আগে তাঁর হঠাৎ-মৃত্যুতে সমাজ-বিদ্যার অনুশীলনে যে কতখানি ব্যাঘাত ঘটেছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। হেগেল, কার্ল মার্ক্স প্রমুখ জার্মান দার্শনিকরা চিন্তাজগতে যে দিক্‌পালের সম্মান পেয়েছেন,

নিঃসন্দেহে ম্যানহাইম সেই সম্মান বিশ্বৎজনের কাছে দাবি করতে পারেন। তাঁর মতো নির্ভীক স্বাধীন চিন্তার অধিবক্তা বর্তমান কালে ক্রমেই দুর্লভ্য হয়ে উঠছে। চিন্তার স্বাধীনতায় ও বলিষ্ঠতায় নয় কেবল, তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদিতায় ও সততায় তাঁর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া ভার। স্বভাবতঃই তাই স্বদেশে জর্মানিতে ফ্যাশিজমের অভ্যুদয়ের পর, চিন্তার ক্ষেত্রে যখন চোয়াড়দের দৌরাত্ম্য বাড়ল এবং স্বাধীন মানবসুলভ বিচারবুদ্ধিকে গোলাবারুদের জোরে বধ করবার চেষ্টা হল, তখন ম্যানহাইম দেশত্যাগী হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। কতকটা অনুরূপ কারণে বোধ হয় একদা কার্ল মার্ক্সকেও তাই করতে হয়েছিল। তারপর থেকে যতদিন ম্যানহাইম বেঁচে ছিলেন ততদিন জ্ঞানতপস্বীর মতো দুরূহ সমাজবিদ্যার কঠোর সাধনা করেছেন এবং তাঁর অবর্তমানেও যাতে এই বৈজ্ঞানিক ও বন্ধনমুক্ত জ্ঞানসাধনার ধারা অব্যাহত থাকে তার জন্য বৃহৎ একটি সাধকগোষ্ঠীকেও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ম্যানহাইমের মৃত্যুর পরে তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে *Freedom, Power and Democratic Planning* এবং আলোচ্য বই *Essays on the Sociology of Culture* বিশেষ উল্লেখনীয়। সমাজবিদ্যার ভাণ্ডারে, তাঁর অন্যান্য আরও অনেক রচনার মতো এই রচনাও স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত থাকবে।

ম্যানহাইমের চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে, তাঁরাও তাঁর সুস্পষ্ট প্রগতিবাদিতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। আমার ধারণা, ম্যানহাইমের এই সুস্থ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আধুনিক কালের মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার অন্যতম পরিপূরক। মার্ক্সবাদের মতো যুগান্তকারী সমাজদর্শনও যে সাময়িক রাজনৈতিক উপযুক্তির চাপে কতদূর বিকৃত ও কলঙ্কিত হতে পারে, সাম্প্রতিক কালে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অনুরাগীদের অতিভক্তি ও অন্ধ গোঁড়ামি আজ মার্ক্সবাদের মতো একটা সুস্থ সবল বৈজ্ঞানিক চিন্তারীতিকে টেনে-হেঁচড়ে মধ্যযুগীয় অপ্রতর্ক্য ধর্মতত্ত্বের স্তরে নামিয়ে আনছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? ধর্মশাস্ত্রের আসল তত্ত্বকে বিকৃত করে একসময় যে পুরোহিতশ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করেছিল, চলন্ত ইতিহাসের চাকার তলায় সেই পুরোহিতরাই লুপ্ত হয়ে গেছে, মানুষ বা তার প্রকৃত ধর্ম লুপ্ত হয়নি। মার্ক্সবাদের "সরকারী" যাজক-সম্প্রদায় আজ যদি তাকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থে কলঙ্কিত করতে চান, তাহলে পরিণাম তাঁদেরই ভয়াবহ হয়ে উঠবে, মার্ক্সবাদের নয়। তার কারণ, টীকাকারদের ব্যাখ্যানের চেয়ে আসল শাস্ত্র অনেক বড়, এবং শাস্ত্র ও তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড় মানুষ। এমন দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই সেইদিন আসবে, যখন বুদ্ধিমান মানুষ তার স্বাধীন সুস্থ বিচারবুদ্ধির উপর কোন স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর হুকুমদারি বরদাস্ত করবে না। ক্ষুধার্ত মানুষের সংগ্রামের পালা শেষ হলে শুরু হবে বুদ্ধিমান মানুষের সংগ্রাম, এবং মনে হয় সেইটাই হবে সভ্যতার শেষ সংগ্রাম। অর্থাৎ ঔদরিক বিপ্লবের পর বুদ্ধি-বিপ্লব। উদরের ক্ষুধা মিটে যাবার পর মানুষ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে অবাক হয়ে যাবে যে তার বহু পুরাতন দাসত্বের বন্ধন ঘোচেনি। সে দেখবে যে তার প্রখর বুদ্ধি দিয়ে সে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে এবং তার জীবনের হর্তাকর্তা রাজনৈতিক মাতব্বরদের ঘন ঘন ডিগবাজি দেখে বাহবা দিয়েছে। তখন সে তার শেষ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হবে। ম্যানহাইমের রচনাবলী আগাগোড়া পাঠ করলে এই ধরনের একটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগে। গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্র, ব্যক্তি গোষ্ঠী ও পার্টি,



মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী—প্রধানত এই সব সমস্যা নিয়েই ম্যানহাইম সারাজীবন অনুশীলন করেছেন। তাঁর সন্ধানী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোকে প্রতিটি সমস্যার জটিলতা ও বিরোধগুলি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। অযুক্তি কুযুক্তির পর্দাগুলি সরিয়ে তিনি তাদের ভিতরের পাঁজরগুলি পর্যন্ত দেখিয়েছেন। আশ্চর্য এই যে তাঁর বিশ্লেষণমুখী বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন কখনও কেবল বুদ্ধি মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যুক্তির চোরাগলিতে ঘুরপাক খায়নি। অনেক অলিগলি খানাডোবা সমাজবিজ্ঞানের আলোকে অতিক্রম করে, শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্ত ও সুস্থ বুদ্ধির প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন, এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ও মানুষ দুয়েরই বিপুল সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। সমাজবিজ্ঞানকে ম্যানহাইম কালোপযোগী করে নানাদিকে তাকে প্রসারিত করেছেন, এবং যেহেতু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মার্ক্সবাদের দান সর্ববাদিসম্মত, সেই হেতু তাঁর চিন্তাকে আমি মার্ক্সবাদের পরিপূরক বলেছি।

আলোচ্য বইখানিকে সম্পাদকরা তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে লোকমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামাজিক রূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে (Towards the Sociology of the Mind); দ্বিতীয় ভাগে বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা এবং তাঁদের অতীত ও বর্তমান ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে (The Problem of the Intelligentsia: An Enquiry into its Past and Present Role); তৃতীয় ভাগে, আধুনিক যুগে সংস্কৃতির গণরূপায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে (The Democratisation of Culture)। ম্যানহাইমের বহু অপ্রকাশিত রচনা থেকে বিষয়গুলি নির্বাচন করে সম্পাদকরা সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। সামাজিক বিষয়ে সচেতন ও সন্ধানী যাঁরা, তাঁদের কাছে বিষয়গুলির গুরুত্ব উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি। সাম্প্রতিক কালে যে-সব বিষয় সজাগ মানুষের মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে বলা চলে, ম্যানহাইমের আলোচ্য গ্রন্থে ঠিক সেই বিষয়গুলিই সন্নিবেশিত হয়েছে। বোঝা যায়, বিদ্যাচর্চা কোনোকালেই ম্যানহাইমের আত্মবিলাসে পরিণত হয়নি। যত দুরূহ ও জটিল সমস্যাই হোক না কেন, তিনি অগাধ আত্মবিশ্বাস ও অসীম দুঃসাহস নিয়ে তার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের কলাকৌশল প্রয়োগ করে তার আপাতবিরোধ ও জটিলতা ভেদ করবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান কালে অগণিত সমস্যাক্ষুব্ধ সমাজসমুদ্রে সমাজবিজ্ঞানীই যে পারাপারের একমাত্র কাণ্ডারী, এ-সত্য ম্যানহাইম যেমন নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমন বিষয়ানুগামীদেরও উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধৈর্যের মধ্যে যেমন একদিকে তাঁর জাতীয় জার্মান চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রখর যুগচেতনাও আত্মপ্রকাশ করেছে।

লোকমানসের সামাজিক রূপ নির্ধারণ করা যে রীতিমত কঠিন, একথা স্বীকার করে নিয়েই ম্যানহাইম বিশ্লেষণের পথে (গ্রন্থের প্রথম ভাগে) অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই হেগেল ও কার্ল মার্ক্সের ইতিহাস-দর্শন তাঁকে বিচার করতে হয়েছে। বিচারপ্রসঙ্গে তিনি ইতিহাসের ধারায় ভাব ও বস্তুর অদ্বৈত সত্তায় অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। এদিক থেকে ম্যানহাইমকে কতকটা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বললে বোধ হয় ভুল হয় না। সমাজ-জীবনে কোন সময় ভাবপ্রাধান্য, কোন সময় বা বস্তুপ্রাধান্য দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানীর মন সত্যের খাতিরে তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু ভাব বা বস্তুর নির্দিষ্টতাকে স্বীকার করে নিলে সত্যকে বিকৃত করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী তা করতে পারেন না। ভাব ও বস্তুকে

দ্বিখণ্ডিত করে দেখলে, হেগেলীয়ান ও মার্ক্সবাদীদের মতো, সত্যকে খণ্ডিত করা হয় বলে ম্যানহাইম মনে করেন। তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন :

How was it possible to doubt the social character of the mind and to ignore the mental involvements of social behaviour? To cogitate an abstract intellect without concrete persons who act in given social situations is as absurd as to assume the opposite, a society without such functions as communication, ideation, and evaluation. (P. 34)

ভাব বা বস্তু, যারই হোক, নির্দিষ্টতা মেনে নেওয়ার অর্থ হল, অনেকটা নিয়তিবাদকে মেনে নেওয়া। নিয়তি বৈকি! অদৃষ্টের লিখন যেমন কেউ খণ্ডাতে পারে না, তেমনি যেন অর্থনীতির লিখনও কেউ খণ্ডাতে পারে না। মার্ক্সবাদ ক্রমেই এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেছে, এবং তারই ফলে তার প্রভাবপুষ্ট যারা তাদের নতুন চিন্তাশক্তি মনে হয় যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অর্থনীতির কতকগুলো মান্ধাতার (মার্শাল-রিকার্ডোর বলা যায়) আমলের চাঁছাছোলা বুলির মানদণ্ড দিয়ে ব্যক্তিচরিত্র, সমাজ-জীবন, শিল্পকলা-সাহিত্য, রাজনীতি ইতিহাস দর্শন, সব কিছু সম্বন্ধে চরম রায় দিয়ে ফেলার যে যান্ত্রিক অভ্যাস, সেটা মূলত নিয়তিবাদীদের কপালে হাত-ঠেকানোর অভ্যাসের মতো অবৈজ্ঞানিক। ম্যানহাইম এই নিয়তিবাদ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তা করলেও তিনি ইতিহাসের বাস্তব-ব্যাখ্যার যথার্থ গুরুত্ব দিতে কুণ্ঠিত হননি। মার্ক্সীয় পদ্ধতির (মনে হয়, ভাষ্যকারদের মার্ক্সবাদ, মার্ক্স বা এঙ্গেল্‌সের মৌলিক মতবাদ নয়) কঠোর সমালোচনা করেও, ম্যানহাইম আলোচ্য গ্রন্থে এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও, সমাজ-বিজ্ঞানে মার্ক্সবাদের গুরুত্বপূর্ণ দান নির্ভয়ে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

. . . indeed, we do not hesitate to perceive thought matters in categories derived from economics. One need not conceive economics as an all-inclusive field, or share the bias of an economic determinism, to realize that the most fundamental social categories were first elaborated in the field of economics. It is one of those disciplines which were first to free themselves from theological constrictions . . . If there is to be a heirarchy of framework, that of sociology is more inclusive than that of economics, and it proves so particularly in its application to communicated ideas. This claim does not contradict the observation . . . that economic relationships in their entirety have a greater continuity than others, and that they tend to set the pattern for human relationships in a variety of spheres of interaction. One may well acknowledge this and still insist that economic behaviour is but an aspect of social action. (Pp. 52-53)

এত প্রাঞ্জল ভাষায় ম্যানহাইম তাঁর বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করেছেন যে টীকা করে তার



ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব, এবং ব্যাপকতা, দুইই তিনি স্বীকার করে বলেছেন যে, তা সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে সমাজে মানুষের নানাবিধ কর্মের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্ম প্রধান হলেও একটি। মানুষের বিচিত্র সামাজিক জীবনের একটি দিকই কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং কেবল তাই দিয়ে সমগ্র সমাজসত্তার বা ব্যক্তিসত্তার বিচার করা যায় না। কর্মজীবনের অন্যান্য দিক কেবল তারই প্রতিচ্ছায়া, এমন কথাও মেনে নেওয়া যায় না। এই বক্তব্যের পর ম্যানহাইমের সঙ্গে মার্ক্সের যে ব্যবধান দেখা যায় তা দুস্তর নয়। এমন কি, মূলত উভয়ের মধ্যে সত্যিই কোন ব্যবধান আদৌ আছে কিনা, তাই নিয়ে রীতিমত তর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। থাকলেও তাকে নিঃসন্দেহে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদের ('রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মার্ক্স-বাদ নয়) পরিপূরক বলা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ম্যানহাইম বর্তমান সমাজে বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর সমস্যা ও ভূমিকা সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা করেছেন। তৃতীয় ভাগে বিশেষ করে, সংস্কৃতির দ্রুত গণরূপায়ণের ফলে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর (বুদ্ধিজীবীরা সহ) মধ্যে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন ম্যানহাইম। বর্তমান যুগে বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশি এবং ম্যানহাইম বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে এত ব্যাপক ও বিশদভাবে বিচার করেছেন যে সমালোচনা-প্রসঙ্গে তার সঠিক বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব বলা চলে। এখানে তার সামান্য একটু আভাস দিচ্ছি।

ম্যানহাইমের ভাষায়—'We live in a time of conscious *social* existence' —আমরা আজ সচেতন সামাজিক সত্তার যুগে বাস করছি। কথাটা ছোট, কিন্তু গুরুত্ব খুব বেশি। তাৎপর্য হল, ব্যক্তিসত্তার চৈতন্যের পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে আজ আমরা সামাজিক সত্তার চৈতন্যের যুগে পৌঁছেছি। ব্যক্তিচৈতন্যের প্রখরতা সম্বন্ধে কোন দ্বিরুক্তি তো থাকতেই পারে না। সেই রেনেসাঁসের যুগ থেকে তার সূচনা হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক যুগের অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আজ সেই চেতনা যে ক্ষুরধার হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গণতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক অগ্রগতিও তার সহায় হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করলে গণতন্ত্র কলঙ্কিত হয় এবং স্বাধীনতা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হতে পারে। তাহলে তাকে আবার দমন করার প্রয়োজন হয়, সমাজের কল্যাণে। দমন করলে গণতন্ত্রের নিষ্কলঙ্ক নীতির গায়ে নিশ্চয় আঁচড় লাগে। গণতন্ত্রের প্রগতির ফলে গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তিরও সমাজে বিকাশ হচ্ছে, ব্যক্তিজীবনে ও গোষ্ঠীজীবনে দুই ক্ষেত্রেই। ডায়ালেকটিক্‌সের ক্রিয়া অবিরাম এখানেও চলেছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গোষ্ঠী-স্বাধীনতা দুইই নৈরাজ্যের পথযাত্রী হতে পারে, অন্ততঃ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে সে-পথে কোন অন্তরায় নেই। ব্যক্তিচৈতন্য যত প্রখর হবে, সমাজ তত বেশি গোষ্ঠীবিভক্ত হবে। অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের বড় বড় সামাজিক বিভাগগুলি ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। স্বার্থও কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থের মতো একরঙা পদার্থ থাকবে না। নানারঙের রামধনু রঙে সামাজিক স্বার্থ রঞ্জিত হয়ে উঠবে। হাজার রকমের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের কলরবে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তাই দিয়ে কোন শ্রুতিমধুর ঐকতান রচনা করা কোন স্বপ্নবিলাসী সমাজকর্মী বা পার্টিনেতার পক্ষে সম্ভব হবে না। মদন-ভস্ম প্রসঙ্গে কবি যেমন বলেছিলেন, 'ভস্ম করে একি করেছ সন্ন্যাসী, বিশ্বমাঝে দিয়েছ

তারে ছড়ায়ে'—তেমনি ব্যক্তিগত-গোষ্ঠীগত-শ্রেণীগত-জাতিগত-ধর্মগত-ভাষাগত প্রভৃতি নানা রকমের প্রখর চৈতন্যের তাণ্ডবলীলার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে তখন বলতে হবে—মুক্ত করে (চৈতন্য) এ কি করেছ রাজনীতিক, লুণ্ঠিত পথে দিয়েছ মোদের এগিয়ে'। গণতন্ত্রের ধ্বংসের বীজ গণতন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে এবং সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। তাহলে কি গণতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য? এবং বিকল্পে নৈরাজ্যতন্ত্র বা নায়কতন্ত্র ভিন্ন আর কিছু ভাববার উপায় নেই? ম্যানহাইম বলেছেন, হয়ত আছে, ভবিষ্যতের মানুষ নিশ্চয় এর উন্নততর সমাধান করবে। গণতন্ত্রই প্রসারিত হবে, কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে, নতুন পথে। সে-পথ বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) পথ। রাজনৈতিক পার্টি, গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট ও রাষ্ট্র, সামাজিক সংঘ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান, সব কিছুর বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী, নতুবা বিশৃঙ্খলা ও বিলোপ থেকে রেহাই নেই।

গণতন্ত্রের ক্রম-প্রসারতার এই পটভূমিকায় ম্যানহাইম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে তাঁর প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। তিনি বলেছেন :

The proletariat was the first group to attempt a consistently sociological self-evaluation and to acquire a systematic class-consciousness.

Social consciousness is no longer a privilege of the proletariat; we find it also in the upper classes, and it evolves more and more in every discernible grouping . . . (P. 96)

The rise of the intelligentsia marks the last phase of the growth of social consciousness. (P. 101)

The intelligentsia is an interstitial stratum and the proletarian sociology, centred as it is around the concepts of class and party, could not but assign to this classless aggregation the role of a satellite of one or another of the existing classes and parties. (P. 104)

এইভাবে বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন ম্যানহাইম। তারপর নানা শাখা-প্রশাখায় আলোচনা বিস্তারিত করে, তিনি বুদ্ধিজীবীর ঐতিহাসিক ভূমিকা (অতীতে ও বর্তমানে), সমসাময়িককালে বুদ্ধিজীবীর সমস্যা ও ভূমিকা, রাজনৈতিক পার্টি ও বুদ্ধিজীবী, শ্রেণীসংগ্রামে বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক গবরুপায়নে বুদ্ধিজীবীর সমস্যা ও কর্তব্য ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতি সুবিচার করতে হলে 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা' সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে আলোচনা করতে হয়। ইচ্ছা রইল, পরে সুযোগ মতো সেইভাবে আলোচনা করবার। আপাততঃ বলা যায়, বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও সমকালীনতার জন্য তো বটেই, আলোচনার ব্যাপকতা, বিশ্লেষণের গভীরতা এবং শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির জন্য ম্যানহাইমের অন্যান্য গ্রন্থের মতো আলোচ্য গ্রন্থখানিও একালের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

**বিনয় ঘোষ**



**দেওয়াল** (১ম ও ২য় খণ্ড)—বিমল কর। ডি. এম. লাইব্রেরী। কলিকাতা, ৬। মূল্য ৪·৫০ ন. প. ও ৬, টাকা।

বাস্তবতা সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের একটি ধারণা বিদ্যমান; যথা, মাছ যখন জলে, মাছটি যেকালে জীবন্ত, যখন তাহা সুন্দর, তখন সেই প্রাণকে তাঁহারা বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সে-প্রাণকে বাস্তব বলিয়া তখনই গ্রহণ করেন যখন তাহা পচিয়া গলিয়া দুর্গন্ধময়।

এই বাস্তবতাকে একমাত্র বলিয়া, সরলমতি জন-সাধারণ নিশ্চিত মানিয়া লইবেন না, আমরা জনসাধারণ মাত্র। এখানে প্রকাশ থাক যে, আমাদের ধারণাকে অভ্রান্ত করিবার জন্য কিছু আকাশের নিলীমা এবং উপনিষতের ধ্যানের উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

জীবন নিজেই বিস্ময়, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম। একথা বিমল কর অল্প বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কাল-ধর্ম অথবা যাহাকে অপরিণত মস্তিষ্ক ইতিহাস বলে, তাহা জীবনের রহস্যে আঁচড় কাটিতে সক্ষম হয় না। জীবনকে বুঝিবার ব্যাকুলতাকেই সভ্যতা বলে, এমত বিশ্বাস হয়। এই সত্য এই সভ্যতাকে সম্মুখে রাখিয়া "দেওয়াল" উপন্যাসের বিস্তার।

আমরা সর্ব বিষয় দুঃখী, আমাদের দেশে অগণন উপন্যাসকার বর্তমান, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই অসাধু এবং অসংযত। ই'হারা শ'-এর মতকেও খণ্ডন করিয়াছেন : "It is clear that a novel cannot be too bad to be worth publishing, provided it is a novel at all and not merely an ineptitude." শ'-এর মত এতেক বাট্টা আর কেহই দিবে না, তথাপি তিনি ineptitude কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

এই ineptitude তথা ছাইপাঁশ কথায় যে সিদ্ধি হয় তাহা আমাদের জানা ছিল না। কোথাও ব্যাকুলতা বোধ নাই, রোক নাই, শিব নাই। ইদানীং কালে কেবলমাত্র নাম করা যাইতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি"র কথা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী'র "মহাস্থবির জাতক"-এর কথা। "মহাস্থবির জাতক" উপন্যাসে এক বিন্দু জল নাই, ইহা সত্যই গোঁড় উপন্যাস।

এ যুগে লেখক, পাঠক-পাঠিকার মৃদুনি কুসুমাদপি মনকে কোন ক্রমেই ব্যস্ত করিতে চাহেন না, প্রত্যেকটি নায়ক-ই কেনসিংটনিয়ান বাবু (Kensingtonian Babu); নায়িকা শুধু মাত্র বিবাহ যোগ্যা, অনেকটা চাতকের মতই বিবাহের জলের আশায় বসিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নৃতনত্ব আনেন, কাহারও নায়িকা শুধু মদেই নেত্যকালী হইয়া যায়, কাহারও বা স্ত্রী চরিত্রের ঘড়িঘড়ি মাজায় ব্যথা হয়, কোন বৃদ্ধ লেখক শরৎ চাটুজ্জের ডি গুপ্ত-সেবী নায়কের হাতে খুঞ্জুনী তুলিয়া দেয়। কোন লেখক সাম্রাজ্যবাদী-জগতের ফুরসৎ লইয়া নারীদেহকে ঢালিয়া সাজিয়া দেন। কোন লেখক কন্তা-পেড়ে গোঁফ লাগাইয়া চরিত্র সৃষ্টি করে। ই'হারা জনপ্রিয়।

ই'হারা এত জনপ্রিয় যে, অদ্য যদি ইহারা নায়িকার ভূমিকায় অর্ধের লোভে (তাহা পারে) নামে, তাহা হইলে ভক্তিমান পাঠকমণ্ডলী গর্বিত হইবে। কারণ আমাদের নামে রুচি আকণ্ঠ। বর্তমান সমালোচককে কোন প্রকাশক বলিয়াছিলেন, 'ইহাদের জনপ্রিয় হইবার মূলে গ্রন্থের মলাট এবং গ্রন্থের নামকরণ', একথা হয়ত সত্য। তাহা ব্যতীত মারণ উচাটন জানা থাকিলে বই বিক্রয় হওয়া তথা জন-প্রিয় হওয়া অনায়াসে যায়।...

ঠিক এই সময়ে আমরা "দেওয়াল"-এর মত সুন্দর সরল সুলিখিত উপন্যাস পাইব আশা করি না। প্রকাশ থাকে যে, "দেওয়াল" সর্ব সমেত তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবার কথা, এতাবৎ দুই খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ ইহার সময়, সহজ জীবন-যাত্রা ইহার বিষয় বস্তু। লেখক কোথাও যুদ্ধের অজুহাতে মজুর মহাজনের হিসসা লইয়া পাঠককে ভাবপ্রবণ করিবার সহায়তা করেন নাই। রাজা প্রজার বিচার লইয়া আওয়াজ তুলেন নাই। অথচ ইহার মধ্যে স্বাধীনতার লড়াই বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একমাত্র বাঁচার প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া যাহারা জীবন ধারণ করে তাহাদেরই কথা ইহাতে আছে। সভ্যতার কথা আছে। রক্তময়ী, বাসু, সুধা ইহাদের কোনই ক্ষোভ নাই, শুধু মাত্র দাঁতে দাঁত দিয়া বাঁচিতে চাহে। জীবন-ধারণই একমাত্র নৈতিকতা। ক্রুসোর হিসাব মত ইহাই প্রথম good, যে But I am alive.

এই ভাল-মন্দের লড়াই কে যোগ দিতে পারে, ভাল কে চায়? তাহার উত্তরে একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন যেMagdalen—এই নাম অমোঘ এবং অধ্যাত্মিক। যথা— "The main purpose of this story is to appeal reader's interest in a subject, which has been the theme of some of the greatest writers', living and dead, but which has never been, and can never be, exhausted, because it is a subject eternally interesting to all mankind. There is one more book that depicts the struggle of human creature, under those opposing influences of Good and Evil, which we all have felt, which we all have known. It has been my aim to make the character of 'Magdalen', which personifies this struggle, a pathetic character even in its perversity and its error."
—Willkie Collins.

এখানে সেই ম্যাগদালেন আদর্শই বিভিন্ন চরিত্রে উদজীবিত হইয়া আছে। "দেওয়ালে"র প্রথম পরিবারের সকল সময়ই সেই 'মন্দ' শক্তির সহিত লড়াই করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, গ্রন্থের গতি অতীব মন্থর, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটি চরিত্রই শক্তিমান, বিদগ্ধতাবৎ। সকল আদর্শ মাধুর্য যখন পোড়া লু লাগিয়া থাক, তখনও তাহারা হতাশ হয় নাই, তাহারা চলিয়াছে।

শুধুমাত্র নিরীহ জীবের মত কোনো দিকে তাকাইয়াছে, পুনর্বার ভালবাসিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। পল্টুদা হঠাৎ যখন মোটর চালকের নিকট হইতে পঁচিশ টাকা লইয়া বাসুকে পাঁচ টাকা দিল সে সময় বাসুর মনোভাব অথবা তার পর দিনের রেস্টুরাণ্টে তাহার নীরবতা সতাই আমাদের বিড়ম্বিত করে।

ঠিক এমনি বাসু বিভ্রান্ত হইয়াছে যখন তাহার বয়স আর কিছু বাড়িয়াছে "বাসু বেশ কয়েকবারই চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে আরতিকে। তার বোন নয়, এ তবে কে? জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত দেখেছে তাদের বাড়িতে, তাদের কাছে—আর ব্যাস কোথা থেকে এক চিঠি এল, আর সব কাটাকুটি হয়ে গেল। ইয়ার্কি নাকি?' 'এই দুনিয়া তাজব' (২য় খণ্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা)।

সম্পর্ক ভাঙা নূতন নহে, বাঙালা দেশে সম্বন্ধ সম্পর্ক লইয়া এত্যাবৎ বহু উপন্যাস প্রণীত হইয়াছে। এখানেও তাহা বর্তমান তাহাদের আঁটো জীবনের পক্ষে ইহাও যথার্থ মন্দ।



অবশ্য এখনও নূতন সম্পর্ক কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। নূতন সম্পর্ক আসে নাই। তাহার কারণও যথার্থ যে নায়ক এখনও অল্প বয়সী, তাহার সাহস দৃঢ়তা বীরত্ব জাগিয়া উঠিতেছে মাত্র। মীনাক্ষীদের বাড়ির রাস্তায় ঘাঁণ্ড মারিয়া সাইকেল চালান, চন্দ্রালোকে ছাদে উঠিয়া বোমাবর্ষণ পরিদর্শন করা, সিভিক গার্ডের ডিউটিতে, অথবা ইট নিক্ষেপ করা ব্যাপারে আমরা তাহার সন্ধান পাই।

সুধার হৃদয় শুকাইতেছিল, সুচারুর কোনো খবর নাই। দেহের পরিবর্তন মনকে বিস্মিত করিয়াছে। সেই মন বিভ্রান্ত হইয়াছে নানান ফেরে, এমত কালে নিখিলের সাহায্যে না গিয়া অনায়াসে চিঠি পড়িতে গেল। সে হৃদয়টি তাহার রাতের অন্ধকারে ছিল এবং সে ভাবিতে পারিয়াছিল যে একটি বোমা পড়িবে, আর কে মা কে ভাই কে বোন কোন কিছুর আদল থাকিবে না। সে হৃদয় তাহাকে এমন করিল কেন।

বিমলবাবু অনেক ক্ষেত্রে সঠিক বিচার ক্ষমতা দেখাইতে চাহেন নাই; আমরা বলিব ইহা যথার্থ নহে। সমসাময়িক ইতিহাসকে কব্জা করিয়া সেই সম্পর্কে দশ রশি বক্তৃতা আমাদের কোনো ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই। এ বিষয় তাহার যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। এই সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিকরা আমাদের বারম্বার সচেতন করিয়া দিয়াছেন, একজনের কথাই ধরা যাক, 'Writers who insert long-winded set speeches in historical works, or who introduce perpetual declamations are of censure. They not only break the continuity of their narrative by the irrelevance of these intrusive orations, but they interrupt the play intellectual curiosity in the minds of even the most enthusiastic seekers after historical knowledge.'—Diodorus. ইতিহাসেই যদি এই বিধি নিষেধ থাকে তাহা হইলে উপন্যাসের ব্যাপারে কি আন্দাজ সংযত হওয়া উচিত তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। গিরিজাপতির চিন্তাধারা আমাদের ভাল লাগে নাই।

ইহা ব্যতীত মীনাক্ষী, এখানে চৌথস লেখক বিমলবাবু দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে লোক নন্দীর মত এক চরিত্র আনিতে পারে সে অবশেষে কিনা মীনাক্ষীর খেলা দেখাইল। ইহা ঠিক ইদানীং কালের ব্যাপার নয়, বিদ্যাসাগরের যুগের সমস্যা।

গিরিজাপতির চিন্তা ও মীনাক্ষীর রাসলীলা বাদ দিয়া বিমলবাবুর লড়াই-এর কথাই আমাদের স্মরণ করান উচিত ছিল। সভ্যতার কথা বলা উচিত ছিল।

আর লড়াই! বহুদূরে এখন আমরা, লড়াই সে কবেকার কথা! যখন দিকে দিকে বোরখা পরিহিত আলো, যখন হোঁ হোঁ করিয়া সাইরেণ বাজিয়া উঠিত। তারই মধ্যে বাজারে মাছ সস্তা হইবে বলিয়া থলি লইয়া অনেকেই বাজারে ছুটিত। কি দুর্ভাবনা নিজেকে লইয়া, মনে পড়ে? আমি যদি এতটুকু প্রতীয়মান হই তাহা হইলেই মৃত্যু।

এবং সেই কৃপাশ্রিত অন্ধকারে কতবার না আমরা সেই তিন ভগনীকে দেখিয়াছি, যাহারা দৈব বলে যত্রতত্র গমন করে, যাহার তাহার পথ আটকাইয়া বিজয়ের আশা উদ্দীপনা দিয়া বাষ্পের মতো মিলাইয়া যায়। বিস্ময়ে আমাদের গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। তিন ভগনীকে আমরা দেখিয়াছি লড়াই-এর ব্ল্যাক আউটে। (রাতে স্ফূর্তি যখন দিনমানে সারিয়া লওয়ার বাগ মানিল) তখন তাহারা বলিয়াছে উত্তিষ্ঠত হও, জাগ্রত হও, ধনী হও... হেল টু দি ধনী হইতে চাহিয়াছে কে মরিল কে বাচিল দেখিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

বড়লোক হইতে চাহিয়াছে...তাহারই মধ্যে অগণন লোক ছিল যাহারা উত্তরোত্তর মূল্য স্ফীতির ফলে মান হারাইয়াছে, কিন্তু মন হারায় নাই। সে কথা বিশদভাবে বিমলবাবুর বলা উচিত ছিল।

বিমল কর বিরাট ক্যানভাস লইয়া বসিয়াছেন। এরূপ বিরাট মানাইতে হইলে যে কাব্যধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই বলিব না, যেটুকু সৃষ্টি হইয়াছে একমাত্র তাঁহারই দ্বারা সম্ভব, অন্য লেখকরা ইহার ধারে কাছে যাইতে পারিত না, তবে এ বিষয় তাঁর আরও গভীর হওয়া কর্তব্য। পয়েটিক টার্ন নাই বলিয়া আমাদের দেশের উপন্যাস, (বঙ্কিমবাবুর পর খুব কিছু হয় নাই) এত কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। কাব্যধর্ম বলিতে পাদবিন্যাস আমরা বলি না। কাব্য বলিতে দুঃখ বোধ আধ্যাত্মিকতাই বুঝি।

**কমলকুমার মজুমদার**

**বাংলার বাউল ও বাউল গান**—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা বারো। মূল্য পঁচিশ টাকা।

বাঙালীর ধর্ম-কর্ম ধ্যান-ধারণার, ভাষান্তরে মানস-জীবনের, ধারাবাহিক ইতিবৃত্তেই বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস। চার দেয়ালের মধ্যে এই ইতিহাস রচনা অসম্ভব। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অজস্র লৌকিক দেবদেবী, জীবন-চর্যার বহু-বিচিত্র নিয়ম-পদ্ধতি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যসংগ্রহ ব্যতিরেকে বাঙালীর মানস-জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা বিজ্ঞান-সম্মত নয়। এই ইতিবৃত্তের উপযোগী সন্ধান ও সংগ্রহ করবার বিষয় বাংলাদেশের সর্বত্র যে কত ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীকে 'পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার' চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে অনুরোধ সে আহ্বান সেদিনের মতো আজও প্রায় দেশবাসীর অশ্রুত-ই রয়ে গেছে। পুঁথিসর্বস্ব আলয়কেন্দ্রিক ইতিহাস-চর্চার মোহ এখনও আমাদের অধিকাংশ গবেষকেরই চিত্ত অধিকার করে রয়েছে; দেশীয় ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এই খেদজনক দৃশ্যের অবসান এখনো ঘটল না।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি বাংলাদেশের এমন একটি উল্লেখ্য অথচ অবহেলিত ধর্ম-সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা, যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কাজ হয়েছে তা প্রায় যৎসামান্যের পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই বাউল সম্প্রদায়ের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এবং তৎপরবর্তীকালে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন ও অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন আর-একটু ব্যাপকভাবে বাউলদের সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন পণ্ডিত গবেষক অবশ্য এদের সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তবে একমাত্র মনসুরউদ্দীন ও অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনকে বাদ দিলে, বাউল-গান সংগ্রহ বা বাউলদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার পরিশ্রমের কৃতিত্ব সমালোচ্য গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। দীর্ঘ পনের-ষোল বছর ধরে পরিশ্রমের ফলে তিনি বাউলদের জীবন-চর্যা, সাধন-



পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রচুর মূল্যবান তথ্য ও অজস্র বাউলগান সংগ্রহ করেছেন এবং অপূর্ব নিষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থে সেই সব তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন অলিখিত বাউল সাহিত্যকে লিপিবদ্ধ করার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মধ্যে সেই প্রয়াসের সার্থক ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হল।

বাউল একটি ধর্ম-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। মুসলমান বাউলরা সাধারণত 'ফকির' ব'লে অভিহিত হন, কোথাও কোথাও সাধারণ ফকিরদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য বোঝাবার জন্য 'নেড়ার ফকির' নামটি প্রযুক্ত হয়। হিন্দু বাউলরা কোন কোন স্থানে 'রসিক বৈষ্ণব', 'রসিক-পন্থী' ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয়।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার দত্ত পরিবেশিত বীভৎস সংবাদের ভিত্তিতে বাউলদের সম্পর্কে সাধারণ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মে গেছে। আসলে অক্ষয়কুমার অঙ্কিত বাউল এবং সত্যকার বাউলের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। বাউলরা, নরমাংস-ভোজন তো দূরের কথা, সাধারণভাবে মাংস-ভোজনও করে না; শবের বস্ত্র পরিধান করার কোন রীতিও তাদের মধ্যে নেই; মাছ অনেকে খায় বটে, কিন্তু নিয়ম-বহির্ভূত বলে মাংস খায় না। অদ্ভুতত্ব বা বীভৎসতা বাউলদের মধ্যে প্রায় দুর্লক্ষ্য। তারা সমাজের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চায় না, নিজেদের আনন্দেই থাকে। স্বভাবত তারা, 'অতি নিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্ম-গোপনশীল, সাংসারিক ভোগ-বিলাসে উদাসীন, ভাবের ঘোরে আত্ম-সমাহিত ও অন্য-মনস্ক', কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে এখনও অবিচলিতভাবে ধর্মসাধনা করে, উচ্চবর্ণের হিন্দু ও শরীয়ত-বাদী মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অবহেলার পাত্র হিসাবে সমাজ-সংসার আর জীবনের কলরবের বাইরে নিজেদের সাধন-ভজন নিয়ে আনন্দে কালাতিপাত করে।

'বাউল' শব্দটির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" (রচনাকাল পঞ্চদশ শতক) কাব্যগ্রন্থে, যদি শব্দটি উক্ত গ্রন্থের পুঁথির লিপিকারের নিজস্ব সংযোজন বলে মনে না করা হয়। এর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত" (রচনাকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক) গ্রন্থে ও চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত "রাগাত্মিকা" পদে শব্দটির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে বোঝাতে 'বাউল' শব্দটি উক্ত গ্রন্থ-সমূহে বা পদটিতে ব্যবহৃত হয়নি, উন্মাদ বা ভাবোন্মাদ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। এই উন্মাদ-ভাবোন্মাদ (সংস্কৃত বাতুল < বাউল = পাগল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য) অর্থ থেকেই সম্ভবত 'পরবর্তী কালে একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, বেশ-বাস ও আচার-ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার-পরিত্যাগী, আত্মকর্ম-সমাহিত উদাসীন ধর্ম-সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হইয়াছে। এখনও অনেক বাউলকে—বিশেষতঃ রাঢ়ের বাউলকে—'ক্ষেপা' (ক্ষিপ্ত) নামে অভিহিত করা হয়।'

"চৈতন্যচরিতামৃতে" অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও 'বাউল' বলে অভিহিত করেছেন। যদিচ এখানে 'বাউল' শব্দটি ভাবোন্মাদ অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, তবু বাউল সম্প্রদায় অদ্বৈতাচার্য-প্রোক্ত এই অভিধা থেকে বিশেষ অর্থ নিষ্কাশিত করে। বাউলদের সাধনা প্রকৃতি-পুরুষ মিলনাত্মক—রাধা প্রকৃতি, কৃষ্ণ পুরুষ এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেম-মিলনের মাধ্যমে 'এক অদ্বয় নিত্যানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি' তাদের

সাধনার লক্ষ্য। রাধা-কৃষ্ণের এই মিলন তাদের সাধনাগত পরিভাষায় 'গুরুতত্ত্ব' বলে অভিহিত। এই 'গুরুতত্ত্বকে অনেক সময় তারা 'চৈতন্যতত্ত্ব' বলে; এরূপ বলার কারণ বৈষ্ণব গোস্বামীদের মতো তারাও চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণ ও রাধার সম্মিলিত মূর্তি জ্ঞান করে। যাই হোক, প্রকৃতি ও পুরুষের গভীর প্রেম-মিলনের মাধ্যমে নিত্যানন্দময় অনুভূতির স্তরে উন্নীত হওয়া তাদের লক্ষ্য বলে স্থূল দেহকে তারা পবিত্র মনে করে এবং দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উপনীত হবার জন্য কঠোর সাধনা করে। সুতরাং তাদের প্রকৃতি-পুরুষ মিলনাত্মক সাধনপন্থার বীজ তারা "চৈতন্যচরিতামৃত", চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাগাত্মিকা' পদ প্রভৃতিতে খোঁজার চেষ্টা করে। এবং তাদের বিশ্বাস, অদ্বৈতাচার্য নিজে প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যোগমূলক ধর্মপন্থা অনুসরণ করতেন এবং তাঁর সময়ে এই ধর্মপদ্ধতি নিতান্ত ক্রিয়া ও জ্ঞানমূলক ছিল বলে অদ্বৈতাচার্য 'রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত বিগ্রহস্বরূপ' প্রেমময় চৈতন্যদেবের সাহায্যে তাকে প্রেমের উপর স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হ'লে তিনি চৈতন্যদেবকে লীলাসংবরণ করতে বলেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, তাঁরা প্রকৃত প্রেম-নির্ভর প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক প্রেম-ধর্ম-মার্গের সাধক। বাউলরা এর প্রমাণ-স্বরূপ "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "চৈতন্যভাগবত" (বৃন্দাবনদাস রচিত) গ্রন্থদ্বয়ে অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের অর্থবহ উল্লেখের নজির উপস্থিত করে। এখানে উল্লেখ্য যে "চৈতন্যভাগবত"-এ অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ 'অবধূত' বলেও বর্ণিত হয়েছেন এবং উল্লেখের প্রসঙ্গ ও ধরন থেকে মনে হয় তাঁরা 'যোগমার্গাবলম্বী একপ্রকার বৈষ্ণব' ছিলেন। অবধূত ও বাউল সম্বন্ধযুক্ত কি না কিংবা অবধূত ও বাউল কথা দু'টি সমার্থবোধক কি না, এ সব প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর না দিয়েও এবংবিধ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বাউল-ধর্ম-সাধনার বীজ "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "চৈতন্যভাগবত"-এর সময়েই বাঙালীর মানস-জমিতে উপ্ত হয়েছিল। কাজেই বাউলরা যখন অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দকে প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক ধর্মসাধনার পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখে এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রকে বাউল-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু বলে মনে করে তখন তাদের সেই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে বলেই বোধ হয়। এইজন্য, বাউলরা, যাদের তত্ত্ব ও দর্শন বা সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র কোন লিখিত প্রমাণ-গ্রন্থ নেই, চৈতন্যদেবকে 'মহাগুরু' রূপে ভক্তি করে, "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থখানিকে তাদের ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যা করে, এবং উক্ত গ্রন্থের 'রাগমার্গে ভজন' ও 'পরকীয়া ভাবকে নিজেদের ধর্মানুযায়ী গ্রহণ করে। এখানে আরো উল্লেখনীয় যে মুসলমান বাউল বা 'ফকির'রাও চৈতন্যদেবকে 'মহাগুরু'রূপে জ্ঞান করে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক কথা নিজেদের মতের অনুযায়ী গানে ব্যবহার করে, যুগল ভজনকে মূল ভজন বলে মনে করে। বস্তুত, হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন, এমন সমন্বয় অন্য কোন ধর্ম-সাধনায় পরিলক্ষিত হয় না।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও "চৈতন্যচরিতামৃত"প্রকাশের পর বাংলার বাউলধর্ম, যা ছিল বর্তমান বাউলধর্মের নাঁহারিকা-পর্যায়, নূতন প্রেরণা লাভ করে; এই পর্যায়ে ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মুসলমান সহজিয়া ফকির সম্প্রদায় এবং এই দুই সম্প্রদায় মৌলত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হ'লেও একই ধরনের সাধন-পদ্ধতির শরিক ছিল ব'লে কালক্রমে এদের বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত মিলিত সাধনারূপে বাউল-সাধনা পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর, "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রকাশের পর আনুমানিক ১৬২৫ খৃস্টাব্দ নাগাদ বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল বলে অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনুমান করেন। তিনি



এই উদ্ভব-কালের পরিধি আরও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন; অর্থাৎ তাঁর মতে ১৬২৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৬৭৫ খৃস্টাব্দ,—মোটামুটি এই সময়ের মধ্যে বাউল-ধর্ম ও বাউল সম্প্রদায় পূর্ণায়তন রূপ লাভ করে এবং ১৭০০ খৃস্টাব্দ তক একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও এই ধর্ম-সাধনার ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে এই ধারা ক্ষীয়মান ও ক্রমলুপ্তির পথে।

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, মুসলমান সহজিয়া ফকির সম্প্রদায়ের কথা যখন বলা হল, তখন সংক্ষেপে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও বৈশিষ্টের কথা বলে নেওয়া যাক। চরিত্রবিচারে বাউলধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম; হিন্দু, বৌদ্ধ, সুফী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মরসে সঞ্জাত ও পরিপুষ্ট এই ধর্ম বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। পালযুগে (খৃস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নব কলেবর-প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ লাভ করে। হিন্দুর শিব-শক্তিবাদ এই সময় বৌদ্ধ প্রজ্ঞা-উপায়বাদের সঙ্গে একরূপ মিশে গেল। যাই হোক, ক্রমে এই নবরূপান্তরিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান এই তিন শাখায় বিভক্ত হলো। সহজযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শেষস্তর। বৌদ্ধ সহজযান থেকে দেখা দিল মিথুনাত্মক যোগ-সাধনা ও প্রকৃতিবর্জিত যোগ-সাধনা। পালযুগের পরবর্তী সেন যুগে, যে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আত্যন্তিক প্রসারের ফলে বৌদ্ধধর্ম নিস্তেজ ও পরিম্লান হয়ে পড়ে, মিথুনাত্মক যোগ-সাধনায় রাধা-কৃষ্ণ প্রকৃতি-পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন; এরি পরিণতি স্বরূপ দেখা দিল সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ছেড়ে বৈষ্ণব সহজিয়াধর্মের আশ্রয় নিল এবং এমনি ক'রে আস্তে আস্তে বৌদ্ধ সহজিয়াধর্ম বৈষ্ণব সহজিয়াধর্মে রূপান্তরিত হ'য়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ত্রয়োদশ শতকে এল মুসলমানরা; ইতিপূর্বে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে মৌল চরিত্র-সাদৃশ্যের জন্য সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল কিন্তু বহিরাগত এই নব আগন্তুকদের ধর্ম একেবারে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, তাই ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দু-ধর্মের আপোষ সম্ভব হলো না। মুসলমানরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার শুরু করল, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ ক'রে কোনরকমে বেঁচে থাকতে চাইল, তথাকথিত নিচু জাতের হিন্দুদের, সংখ্যায় যারা নেহাত অল্প ছিল না, সমাজের বাইরে রেখে নিরাপত্তা-সন্ধানী হলো। এই নিচু জাতের হিন্দুদের অধিকাংশই ছিল সহজিয়া মতাবলম্বী; এদের অনেকেই তখন সামাজিক সুখ-সুবিধার কথা ভেবে এবং উচ্চবর্ণের ঘৃণা, অপমান ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করলো। এই ধর্মান্তরিতদের একাংশ খাঁটি মুসলমান হ'য়ে গেল, অপর দল নামে মুসলমান হ'লেও আসলে আগের সহজ-ধর্ম পালন করতে লাগলো; এই শেষোক্ত সম্প্রদায়-ই পরবর্তীকালের বাংলার 'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকির-সম্প্রদায়ের পূর্বসাধক। সৌভাগ্যবশত, মুসলমান-রাজত্বের প্রায় সূচনাকাল থেকেই সুফী নামক এক ধর্ম-সম্প্রদায় বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। এই সম্প্রদায়ের আগমনে সহজিয়া-মতের মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সুফীরা কোরানকে অস্বীকার না করলেও শরীয়ত-পন্থীদের মতো গোঁড়া নয়; তারা কোরানকে মানে, কিন্তু কোরানের বাণীর ভিন্নরূপ অর্থ করে, তার নিগূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করে; সহজিয়া মতাবলম্বীদের মতো সুফীরাও মানবদেহের মধ্যে পরমতত্ত্বের অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করে বাহ্যিক আচারপরায়ণতাকে পরিত্যাজ্য মনে করে। এই জন্য সুফীদের সঙ্গে তারা মেলামেশা করতে

শুরু করল, কিছুটা তাদের ঔদার্যপূর্ণ মতবাদে আকৃষ্ট হ'য়ে কিছুটা উভয় ধর্মের সাদৃশ্যের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে মুসলমান-সমাজের বাইরে অবস্থান ক'রে টিঁকে থাকার জন্য। যাই হোক, এ ধরনের মেলামেশার ফলে সহজিয়া মতের মুসলমান 'ফকির'রা সুফীধর্মের প্রভাবাধীন হ'য়ে পড়ল এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দৃঢ় বিশ্বাস 'সুফী-প্রভাবান্বিত এই 'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকিররাই বাংলায় বাউলধর্ম-সাধনার আদি-প্রবর্তক। ইহাদের প্রভাব পরবর্তী যুগের বাউলধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপলাভ করিয়াছে।' পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হওয়ায় বাংলার ধর্মজগতে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হলো। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্মগত বিভেদ-বিদ্বেষ প্রভৃতি উন্মূলিত ক'রে চৈতন্যদেব সহজ সরল ও একান্ত ভক্তিমূলক ধর্ম প্রচার করলেন, উচ্চ-নীচ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে হরিনাম-কীর্তনাশ্রয়ী ভক্তিমূলক ধর্মচ্ছায়ায় আহ্বান করলেন। ক্রমে এই গভীর-ব্যাপক গণধর্মের আওতায় হিন্দুধর্মের একটি বড় অংশ এসে পড়ল, যারা উপায়ান্তর না দেখে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত, তারা ধর্মান্তরণ থেকে নিবৃত্ত হলো। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যে-একটি দলের বিশেষ লাভ হলো সেটি হল পূর্বোক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়। মুসলমান আগমনের পর এদের একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তখনও কিছু সংখ্যক সহজিয়া কোনরকমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই স্বল্প সংখ্যক সহজিয়ারা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলো। চৈতন্যপূর্ব যুগের সহজিয়াদের ধর্ম-পদ্ধতি ছিল যোগক্রিয়ামূলক; অতঃপর চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের সঙ্গে সংসক্ত হ'য়ে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম একটা নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর স্থাপিত হলো। বৈষ্ণব সহজিয়াদের এই ধর্মের সঙ্গে এসে মিশল সুফী-প্রভাবান্বিত মুসলমান সহজিয়া ফকির সম্প্রদায়ের মত-বিশ্বাস। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতের দ্বারা তারা বিশেষ প্রভাবিত হলো এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতো তারাও যুগল-ভজন ও চৈতন্যতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলো। ক্রমে বৈষ্ণব সহজিয়া ও মুসলমান ফকিরদের সাধন-পদ্ধতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বাউল-সাধনা গড়ে উঠল। অবশ্যই এই সাধনার বিবর্তনে বাউল-ধর্মের নিজেরও কিছু বৈশিষ্ট্য কার্যকরী হয়েছিল বৈকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশেষ একটি ধর্ম-সাধনার মূল সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে শিব-শক্তিবাদ (পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের আদি ও প্রাচীন রূপ), রাধা-কৃষ্ণবাদ (শিব-শক্তিবাদের রূপান্তরিত সংস্করণ), বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব, সুফী দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ত্ব ও উক্ত ধর্মসাধনাগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ-সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত ধর্ম-মতই বাউল নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ধর্ম-মতের অনুসারীগণও বাউল নামে পরিচিত। গুরু-পরম্পরা-প্রচলিত এই ধর্ম-মত অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের জনসাধারণের কাছেই সমাদর লাভ করেছিল, কারণ উচ্চবর্ণের জনগণ কর্তৃক অবজ্ঞা-ঘৃণা-নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশ্বাস-বাণী এই নবজাত উদারনীতিমূলক ধর্মের মধ্যেই শ্রুত হয়েছিল; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতের লোককেই এই ধর্ম-মত সহজ-নিবিড় আলিঙ্গন দিয়েছিল। নবধর্মে দীক্ষিত এই সব লোক তাদের বৈশিষ্ট্যপ্রসূত আপাত-অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহারের জন্যই সাধারণ সমাজ এড়িয়ে চলত, নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই নিশ্চিন্ত-নীরব আনন্দে ধর্মচর্যা করত।

এই বাউলরা তাদের তত্ত্ব বা সাধন-পদ্ধতি কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেনি, করার প্রয়োজনও মনে করেনি। যা কিছু সাধন-পদ্ধতির কথা সব গানের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছে। তাদের তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করা হ'লে লিপিবদ্ধ প্রমাণ-হিসাবে তারা বড় জোর "চৈতন্য-



চরিতামৃত" ও কতকগুলি সহজ-তত্ত্বের পদের উল্লেখ করে। কথিত আছে, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন একবার বিক্রমপুরে থাকাকালে এক বাউলকে তারা ভবিষ্যতের জন্য তাদের তত্ত্ব-কথা সংবলিত ইতিহাস রাখে না কেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে বাউলটি বলেছিল, 'আমরা সহজ-পন্থা অনুসরণ ক'রে থাকি, তাই ভবিষ্যতের জন্য কোন চিহ্নাবশেষ রেখে যাই না।' নদীর তীরে এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল। সে সময় নদীতে ভাটা পড়েছিল; কয়েকজন মাঝি নদীর কাদার মধ্যে তাদের নৌকা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে বাউলটি শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়কে বলেছিল, 'যে সব নৌকা ভরা নদীতে চলে তারা পেছনে কি কোন দাগ রেখে যায়? নিজের প্রয়োজন ও তাগিদের বশে যে সব মাঝি কাদায় নৌকা ঠেলে নিয়ে চলছে তারা সহজ-পন্থার মর্ম বুঝবে কি ক'রে? ভক্তজনের হৃদয়ে যে ভক্তির নদী প্রবহমান, সেই নদীতে ভেসে থাকাই ভক্তজনের সত্যিকারের চেষ্টা হওয়া উচিত, একের ভক্তি-ভালোবাসা অন্য সকলের ভক্তি-ভালোবাসার সঙ্গে যাতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়, তার-ই চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের মধ্যে বহু জাতের বহু লোক আছে, কিন্তু তারা সকলেই বাউল, এই একটিই ধর্ম তাদের, এইটি-ই একমাত্র পরিচয় তাদের। এ ছাড়া তাদের নিজেদের আলাদা কোন কৃতিত্ব বা ইতিহাস নেই। গঙ্গায় গিয়ে যে জল পড়ে, তাও গঙ্গার জল বলেই পরিচিত হয়। আমাদেরও তাই এমনি করে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবের জীবন-নদীতে গিয়ে মিশতে হয়, তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব, আমাদের বাঁচা অসার্থক।' এই হল বাউলদের ধর্ম-তত্ত্ব, বাউলদের জীবন-দর্শন। এ তত্ত্ব ও দর্শন তারা শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখে না। গানের মধ্য দিয়ে এ তত্ত্ব ও দর্শন তারা রূপায়িত করে এবং পুরুষ ও শিষ্যানুক্রমে প্রচলিত সেই সব গান থেকেই বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন, ধর্ম-সাধনা, ক্রিয়া-পদ্ধতি ইত্যাদির উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে।

এ প্রসঙ্গে 'বাউল-গান', কথাটার তাৎপর্যের উল্লেখ করতে হয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে কথাটা অত্যন্ত শিথিলভাবে এবং ভুলভাবে চলে আসছে। এর কারণ, গত শতকের শেষের দিকে একদল 'শখের বাউলে'র আবির্ভাব ঘটেছিল; এই ধরনের বাউলদের মধ্যে হরিনাথ মজুমদার ও গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা এবং এদের মতো আরও কয়েকজন গীতিকার মূল বাউল-গানের ছন্দ ও সুরে সাধারণ ভগবৎ-প্রেম ও ভক্তি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, প্রবৃত্তির হাত থেকে নিবৃত্ত হবার নীতি-কথা, বাউল-সুলভ দেহতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে গান লিখেছিলেন; এই সব গানে অনেক সময় সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক প্রসঙ্গ, ভারতনারীর বৈশিষ্ট্য, মায় ভিক্টোরিয়ার দয়া, ভারত-বন্ধু ফসেটের কথা পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। স্বভাবতঃই এ ধরনের অনুকৃতিজ গানকে বাউল-গান ব'লে অভিহিত করা অনুচিত। ভগবৎ-ভক্তি বা বৈরাগ্যের কথা বা মূল বাউল-গানের সুর থাকলেই বাউল-গান হয় না। বাউল-গান একটি নির্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট ধর্ম-মতের সাধন-বিষয়ক গান; সেই ধর্মাবলম্বী সাধকদের সাধক-জীবনের অভিজ্ঞতা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী, সাধন-তত্ত্ব ও দর্শন বা ক্রিয়া-পদ্ধতির কথা যে-সব গানে ব্যক্ত হয়েছে, একমাত্র সেই গানগুলিই 'বাউল-গান' অভিধায় চিহ্নিত হবার যোগ্য। এবং বলা বাহুল্য, প্রকৃত বাউল-গানে এমন একটি স্বাভাবিক সারল্যবলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, কবিতারচনায় অশিক্ষিতপটুত্ব অথচ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীগত এমন একটি অযত্ন-অপ্রসাধনের পরিচয় পাওয়া যায় যে আসল বাউল গান চিনতে খুব বেশি কষ্ট হয় না। কোনটা হাঁরা, কোনটা কাচ, তা চিনবার জন্য খুব পাকা জহুরীর প্রয়োজন হয় না।

এই কারণে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন সংগৃহীত বাউল গানগুলি পাঠ করলে ধ্রুব সংশয় জাগে, এগুলি কি সত্যই গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত বাউলদের রচনা? মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর দু'খণ্ড "হারামণি"তে যে সব বাউল-গান সংকলিত করেছিলেন বা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে যে-সব বাউল গান সংগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক সংগৃহীত গানের এত প্রকট মৌলিক পার্থক্য কেন? শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় সংগৃহীত 'নিঠুর গরজী তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে', 'আমি মেলমু না নয়ন' বা 'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে' প্রভৃতি গানগুলি আশ্চর্য এবং অস্বাভাবিকরকমের আধুনিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও কাব্যরসমণ্ডিত। এই সব গানে 'মানস-মুকুল', 'যুগ-যুগান্তে', 'বেদন' প্রভৃতি শব্দাবলী নিতান্তই আধুনিক কাব্য-রীতি ও বচন-শৈলীর দৃষ্টান্ত; কিংবা, বিশেষ করে যখন 'তারে অরুণ এসে দোলা দিল রাতের শয়নে-র মতো সালঙ্কার ও প্রসাধন-প্রোজ্জ্বল পংক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন ঘনিয়ে-ওঠা সন্দেহ-সংশয় স্থির সিদ্ধান্তের আলোকে সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। বস্তুত শ্রীযুক্ত সেনের এই সব গানগুলিতে রবীন্দ্রকাব্য-সুলভ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, উপমাপ্রয়োগ-নৈপুণ্য, অন্ত্যমিলের দক্ষ ব্যবহার, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ এত অসহজ ও অস্বাভাবিক, যে কারণে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত—'এই গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট আধুনিক হস্তক্ষেপ আছে এবং ইহা পল্লীর অশিক্ষিত বা সাবেকী ধরনের অর্ধ-শিক্ষিত বাউলদের রচনা নয়'—মেনে না নেওয়ার হেতু থাকে না।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের বাউল-ধর্ম-ও সাধনা প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মত ও মন্তব্যও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। প্রথমত, "বিশ্বভারতী পত্রিকা"য় প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সেন বাউলদের সাধন-তত্ত্ব ও সাধন-পন্থতি সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন, বর্তমান বাংলার বাউলদের ক্ষেত্রে তা অপ্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের মতে ক্ষিতিমোহন সেন-প্রোক্ত কথাগুলি 'ধর্মতত্ত্ব ও সাধন-পন্থতি হিসাবে মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধক—নানক, কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতির মধ্যে চলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমান বাংলায় বাউলরা ঠিক ঐ পন্থতিতে সাধনা করে না। বর্তমানে বাংলার বাউলরা যে গান করে, যে ভাবে ধর্মজীবন যাপন করে, ধর্ম-কর্ম করে, তাহার সহিত ক্ষিতি-মোহনবাবু কর্তৃক প্রচারিত গান বা তাঁহার বর্ণিত সাধন-প্রণালীর বিশেষ কোন মিল নাই' (পৃ. ৭৩)। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত : 'তাহাদের গান বিশ্লেষণ করিলে ক্ষিতিমোহনবাবু কর্তৃক উল্লিখিত সাধন-তত্ত্ব বা পন্থতির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই প্রকার সাধন-রীতি তিনি বাংলার বাউলদের উপর আরোপ করিয়াছেন মাত্র (পৃ. ৭৪-৭৫)। দ্বিতীয়ত, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেছেন : 'সহজ ভাব সম্বন্ধীয় যে-কয়খানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সাচ্চা বাউল ভাবের পরিচয় মেলে না।' এই 'সহজ' কথাটির, যার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ বৌদ্ধ সহজিয়া গ্রন্থে বর্তমান, অর্থ কি? বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'সহজ' বলতে বুঝেছেন 'নির্বাণ'; এ 'নির্বাণ' লয় নয়, এক মহানন্দময় অবস্থা, যে অবস্থায় বাচ্য ও বাচকে, জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ে, ভোক্তৃ ও ভোগ্যে কোন ভেদ থাকে না। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন দ্বারা সামরস্যে উপনীত হ'লেই এই অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি হয়; প্রকৃতি ও পুরুষ বৌদ্ধ সহজিয়াদের পরিভাষায় প্রজ্ঞা ও উপায়—এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের 'যুগনদ্ধ' বা মিথুনাকার রূপই সহজ বা নির্বাণ বা মহাসুখের আলয়; কাঙ্ক্ষিতব্য এই আলয়-প্রাপ্তিই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার চরম লক্ষ্য; অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজ-পন্থা রাগের পথ—ইন্দ্রিয়-নিরোধ ও বৈরাগ্যের পথ



নয়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'সহজ'ও এই একই জিনিস। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতো তাঁরাও জাগতিক প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-জনিত আনন্দ লাভের জন্য সাধনা করেন। 'স্বরূপে রাধা ও কৃষ্ণরূপী প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-মিলনের দ্বারাই এই আনন্দ লাভ। এই যুগলেই মহাভাব-রূপী 'সহজ'-এর অবস্থিতি। বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে বৈষ্ণবেরা রাধা-কৃষ্ণ স্থাপন করিয়াছে এবং প্রচুর প্রেমের অবতারণা করিয়াছে। মূলতঃ উভয় সম্প্রদায়ের 'সহজ'-ই এক।' বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের এই 'সহজ'-এ এবং বাউলদের 'সহজ'-এর মধ্যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-সঞ্জাত সেই অপূর্ব আনন্দময় সহজ অবস্থা লাভ বাউলদেরও কাম্য। বিভিন্ন বাউল গানে এ কথা বহুবার বলা হয়েছে। যাদুবিন্দু নামে এক বাউলের গান এর একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ 'বাউলদের 'সহজ', বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'সহজ' এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'সহজ' একরূপ। অন্যপক্ষে, 'ক্ষিতিমোহন-বাবু বাংলার বাউলদের সম্পর্কে যে 'সহজ'-এর বিষয় বলিয়াছেন তাহা উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় কবীর, দাদু, রজ্জব, রবিদাস, সুন্দরদাস প্রভৃতি ভক্ত যোগিগণের 'সহজ'।... ভগবানের প্রতি প্রেমের তন্ময়তাই সহজাবস্থা—প্রেমের পথই 'সহজ'-পথ।...বর্তমান বাংলার বাউলদের 'সহজ' এই প্রকার 'সহজ' নয়' (পৃ. ৮৮-৮৯)। কাজেই শ্রদ্ধেয় সেন 'সাচ্চা বাউল' বলতে যা বুঝেছেন, বর্তমান বাংলার বাউলরা তা নয়, কারণ বাংলার বাউলরা প্রকৃতি-পুরুষ মিলনাত্মক যোগসাধনা-পন্থী; পক্ষান্তরে 'যে-বাউল কোনোরূপ প্রকৃতিবর্জিত সাধনা করিবে না, যে-বাউল ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে...শাস্ত্রাচার বা দেব-দেবতা মানিবে না, কেবল ভগবানের প্রেমে সর্বদা আত্মহারা, উন্মাদবৎ হইয়া থাকিবে ইত্যাদি' সেই বোধ হয় ক্ষিতিমোহন সেনের 'সাচ্চা বাউল'। মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের সন্তদের, বিশেষত কবীরকে, অনেকটা এই ধরনের বাউল বলা যায়। তৃতীয়ত, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের বিরুদ্ধে 'সন্তা ইন্দ্রিয় উপভোগের' যে অভিযোগ এনেছেন, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তাও নির্ভিত্তিক প্রমাণিত করেছেন। অবশ্য এ ধরনের অভিযোগ অক্ষয়কুমার দত্তও এনেছিলেন। আর এ ধরনের অভিযোগের মূলে শ্রদ্ধার অভাব আছে ব'লে মনে হয়। কোন ধর্ম-সম্প্রদায়, এমন কি কোন ব্যক্তিকেও, বিচার করতে হ'লে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া প্রয়োজন, ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে বর্জন করে নিরাসক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারশীল হওয়া কর্তব্য। বাউলধর্মের নির্মিতি ও বিবর্তনে যে পাঁচটি উপাদান কাজ করেছে তাহ'লো : ১। বেদে অবিশ্বাস ও বেদানুমোদিত চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি বিরোধী মনোভাব; ২। গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুতে বিশ্বাস ও ভক্তি,—পরম-গুরু বা ভগবানের প্রতিনিধি মানব-গুরুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা ব্যতিরেকে ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ অসম্ভব; ৩। স্থূল মানবদেহের গৌরব—মানব-দেহের মধ্যেই ভগবানের বাস, দেব-দেবীর অস্তিত্ব 'অনুমানমাত্র, সুতরাং ভগবানকে পেতে হ'লে যে সাধনা করতে হবে তা হবে দেহ-কেন্দ্রিক, নর-নারীর প্রেম-মিলন-কেন্দ্রিক, এক কথায় প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক; ৪। 'মনের মানুষ' (নামান্তরে 'সহজ মানুষ', 'আলেখ মানুষ', 'সাঁই' ইত্যাদি)-র অর্থাৎ মানব-দেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মা বা ভগবানের সন্ধান-সাধনা—এই মনের মানুষ একাধারে পরমতত্ত্ব ও ব্যক্তিগত ভগবান; এবং ৫। রূপ-স্বরূপতত্ত্ব—জগতের প্রত্যেক পুরুষ রূপ-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ, আবার প্রত্যেক নারী 'রূপ'-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। নর-নারী যখন রূপের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হইবে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য প্রেম-লীলা; মর্ত্যের প্রাকৃত

প্রেম-মিলন হইবে নিত্য বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজ-লীলা।' এই পাঁচটি উপাদানের কথা স্মরণে রেখে বাউল-গানগুলি মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠান্তে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাউলরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ নয়, ইন্দ্রিয়াতীতই তাদের সাধনার লক্ষ্য। কামের মধ্য থেকে প্রেমে উত্তীর্ণ হওয়া, প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে দেহের মধ্যেই পরম-তত্ত্বের উপলব্ধি করার জন্যই বাউলদের প্রকৃতি বা নারীসেবা করতে হয়। তাদের কাছে 'নারী আত্মার হ্লাদিনী শক্তি, মহাশক্তিরূপিণী, রসময়ী, প্রেমময়ী' এবং নারী সম্পর্কে এই যাদের ধারণা, নারীকে নিছক ইন্দ্রিয়ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় কি? প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক এই সাধনার পদ্ধতি (সমালোচ্য গ্রন্থের 'বাউলধর্মের সাধনা' নামক অধ্যায়াংশ দ্রষ্টব্য) মার্জিত ও শিক্ষিত লোকের কাছে কুশ্রী ও কুরুচিপূর্ণ ঠেকতে পারে; কিন্তু প্রথমত রুচি জিনিসটা নেহাতই স্থান কাল ও ব্যক্তি নির্ভর ও দ্বিতীয়ত একটি ধর্ম-মতের কঠোর সাধনার সঙ্গে এই পদ্ধতিগুলি বিজড়িত বলে এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের হওয়াই সমীচীন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বহু বাউল গান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'তাহাদের প্রকৃতি-পুরুষ মিলন ইন্দ্রিয়-উপভোগ নয়, ইন্দ্রিয়-দমন। ইহা বিন্দু-ধারণের জন্য সুকঠিন যোগ-সাধনা, ইহার বিশেষণ সস্তা হইতে পারে না, ইহার বিশেষণ-রূপে দুর্লভ কথাটি প্রযোজ্য। ইহা ক্ষয়ের আয়োজন নয়, সঞ্চয়ের সাধনা.....দীর্ঘদিন ধরিয়া অনেক বাউলের পরিচয় পাইয়াছি। তাহার ফলে তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সেবী বলিতে পারি না' (প. ৮১)।

এই হলো বাংলার বাউল ও বাউলগান সম্পর্কিত নির্বাচিত রূপ-রেখা। সমালোচিত-গ্রন্থে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ উপকরণসমূহের সমাবেশে বাউলদের ইতিহাস, জীবনচিত্র ও সাহিত্যের যে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। দীর্ঘদিন ধরে উভয় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে বাউলদের ইতিহাস ও জীবন-কথা সংক্রান্ত মাল-মশলা ও অজস্র বাউল-গান সংগ্রহ করেছেন তিনি। সরজমিনে গিয়ে একটি ক্ষীয়মান ধর্ম-সম্প্রদায়কে—ধর্ম—যে সম্প্রদায়ের 'গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি', 'হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে' যে সম্প্রদায়—প্রত্যক্ষ পড়বার চেষ্টার আনন্দময় ফলশ্রুতি "বাংলার বাউল ও বাউলগান" নামক এই বৃহৎ-কলেবর গবেষণা-গ্রন্থকে সুধীজন ও সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালীমাত্রই স্বাগত জানাবেন ব'লে বিশ্বাস করি।

**কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত**


## জোড়া নামে এক উপত্যকায়

উড়িষ্যার কেওনঝর জেলার নির্জন জোড়া পাহাড় এলাকায় এককোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের একটি কারখানা চালু হয়েছে। ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত তৈরী করবার একটি জরুরী উপাদান।

১৮ মাইল লম্বা নতুন রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত এবং হিরাকুদের বিদ্যুৎ-শক্তিতে চালিত এই নতুন কারখানার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০ টন এবং ক্রমে ক্রমে তা বাড়িয়ে ১০০,০০০ টন করা হবে।

নির্ধারিত সময়ের আট মাস আগেই এই কারখানা তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। এ কাজে রাজ্য সরকার, হিরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা ও রেলওয়ের কাছ থেকে আমরা যে আশাতীত সাহায্য পেয়েছি তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

ইস্পাত উৎপাদন শক্তি চারগুণ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টায় ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ-এর প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বাড়ছে—অতীতের অখ্যাত জোড়া গ্রামের নতুন জীবন ধারার আজ তারই পরিচয়।

**টাটা স্টীল**

কুড়ি লাখ টন উৎপাদনের পথে

**জোড়া ফেরো-অ্যালয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড**

(দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড-এর সহ-প্রতিষ্ঠান)

TN 2027